Dinosaurer Dwipe
On Dinosaur Island
by Salil Biswas

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৬০

প্রকাশক :
সংঘমিত্রা চন্দ
৩এ গোপী বোস লেন,
কলকাতা-৭০০০১২

গ্রন্থস্বত্ব : সমতা বিশ্বাস

অক্ষর বিন্যাস : ওয়েভ - ও - প্রিন্ট
৭৬, মহারাজা টেগোর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩১

মুদ্রক : প্রিন্ট-ও-গ্রাফ
৯সি ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

বাবাই ও মানিকে

সূত্রপাত

মশাটা আর উড়তে পারছিল না। পেটটা ফুলে উঠে ঝুলে পড়েছে। এতক্ষণ প্রাণভরে রক্ত খেয়েছে সে। এখন ফিনফিনে ডানায় ভর দিয়ে কোনো রকমে পেরোতে চেষ্টা করছে সে জলাটা। ওই তো, ওই তো গাছটা এসে গেছে। আর একটু, আর একটু গেলেই বিশ্রাম। শেষ পর্যন্ত গাছটার এবড়োখেবড়ো গুঁড়ির গায়ে বসল সে। দেহটা অতিরিক্ত ভারি হয়ে আছে বলেই তার পুঞ্জাক্ষি অনেকটা ম্লান। তাই সে দেখতে পেল না, ধীরে ধীরে মৃত্যুদূত এগোচ্ছে তার দিকে।

যার রক্তে মশাটার পেট আইঢাই সে স্বভাবতই টেরও পায়নি কেউ তার শরীরে কামড় বসিয়েছে। এই ব্র্যাকিওসরাসটা আকৃতিতে অবশ্য বেশ ছোটই। টন পঞ্চাশেক ওজন হবে হয়তো, আর মাথাটা মাটি থেকে হবে এই তিরিশ ফুট মতো উঁচু। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে পাশের জঙ্গলের গাছের পাতা আর কচি ডাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে, আপাতত তৃপ্ত হয়ে, ব্র্যাকিওসরাস এখন এসে নেমেছে জলায়। মাথা আর গলার খানিকটা বেরিয়ে আছে জলের বাইরে। উঁচু হয়ে দ্বীপের মতো বেরিয়ে আছে তার পিঠ। সেই পিঠের

নিচের দিকে শিরদাঁড়ার উপরেই হুল ফুটিয়েছিল মশা।

জলে নামার আগে একটা বিরাট গাছের পাশ দিয়ে আসতে আসতে তাতে একটু গা ঘসে নিয়েছিল ব্র্যাকিওসরাসটি। তারই ধাক্কায় গাছের ছাল উঠে সেখান দিয়ে ঘন আঠালো রস বেরিয়ে এসেছিল। ধীরে ধীরে গুঁড়ি বেয়ে নামছিল সেই রস।

বসবি তো বস মশাটা এসে বসেছে ঠিক রসের ধারার পথেই। অতিভোজনে আচ্ছন্ন অসতর্ক মশাটা যখন বুঝতে পারল বিপদ এসেছে, তখন খুব দেরি হয়ে গেছে আঠালো রসের ছোঁয়া ততক্ষণে তার ডানা অকেজো করে দিয়েছে। একটু ছটফট করার অবকাশও পেল না বেচারা। ধীরে ধীরে তার শরীরটা পুরো ঢাকা পড়ে গেল সেই রসের তলায়।

কোথাও কেউ টেরও পেল না। ব্র্যাকিওসরাসের চোখ বুজে এসেছে তখন আরামে। পাড়ে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছিল একটা প্রোটোসেরাটপস্। হঠাৎ থেমে শরীর ঘুরিয়ে পিছন দিকে কী যেন সে দেখার চেষ্টা করল। তার জান্তব বোধ তাকে বলে দিল বোধহয়, আশেপাশে কোথাও বিপদ আছে। কিছু ভুল বলেনি তার বোধ। জঙ্গলটার ভিতরে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ উঠেই হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। তার পরেই আকাশবাতাস কেঁপে উঠল হিংস্র গর্জনে। একশোটা বাঘ ডাকছে যেন এক সঙ্গে। শিকার ধরেছে টিরানোসরাস রেকস্।

তারপর কেটে গেল বহু কোটি বছর.....

দোহাই স্যার, না বলবেন না

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা অধ্যাপক অজিত বসুর বরাবরের অভ্যাস। শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি বাদল কোনো কিছুই তাঁর এই অভ্যাসের নড়চড় ঘটায় না। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এক কাপ কড়া কালো চা আর দুটো মুচমুচে টোস্ট খেয়ে নিয়ে প্রাতঃকালীন দৌড়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। কম করে দু'মাইল না দৌড়লে সারাটা দিন গা ম্যাজম্যাজ করতে থাকে। ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে কাজ নিয়ে বসতে হয়। আটটার সময় খবরের কাগজ পড়া। এই সময়টাতেই যা খানিকটা স্ত্রী রায়ার সঙ্গে কথা বলার সময় পান তিনি। তারপরেই তো স্নান খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। হাজিরার কোনো সময় তাঁর জন্যে বাঁধা নেই, তবু এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া পছন্দ করেন অজিত। তারপর দুপুরে ঘন্টা দেড়েক আড্ডা আর চা-কফি খাওয়ার সময় ছাড়া সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা-সাতটা পর্যন্ত গবেষণাগার থেকে বেরোনই না তিনি। অবশ্য সারা রাত ওখানেই থেকে গেছেন, কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে, এমনও ঘটেছে বহুবার।

আজও যথারীতি দৌড়চ্ছিলেন অজিত। এ সময়টা মনটাকে যথাসম্ভব চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু আজ বারে

বারে মন যাচ্ছিল অন্যদিকে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ই একটা গাড়ি লক্ষ করেছিলেন অজিত। সেই গাড়িটা খানিক দূরত্ব বজায় রেখে তাঁর পিছন পিছন আসছে। গাড়ির চালক বা আরোহী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এমনিতে এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তিনি একজন জীবাশ্মবিদ। তাঁর সম্পর্কে কারই বা কী কৌতূহল থাকবে! আর কেউ তাঁর পিছু নেবে এটা তো আরও অবিশ্বাস্য। অথচ গাড়িটা যে তাঁরই পিছনে ঘুরছে, এটা খুব পরিষ্কার। ব্যাপার কী?

একবার ভাবলেন, থেমে জিজ্ঞাসা করবেন কে এই লোকগুলো। কিন্তু তারপরেই মনে হল, ধুর! যত মনের ভুল আমার। কে না কে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে! লেকটা তো আর কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এক রকম জোর করেই চিন্তা মুছে ফেললেন মন থেকে অজিত। ইতিমধ্যে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এসেছে। ফিরতি পথে নিশ্চিন্ত হয়ে দেখলেন অজিত, গাড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না।

বাড়ি ফিরে কাজ নিয়ে বসেছেন অজিত। ক'দিন ধরেই এ সময়টা অনেকগুলো দরকারি কাজ ফেলে তাঁকে একগাদা হিসেব আর সম্ভাব্য কাজের খতিয়ান তৈরি করতে হচ্ছে! দিল্লিতে মন্ত্রীর দপ্তরে জমা দিতে হবে। লাল ফিতের গিঁট ছাড়িয়ে কোনো রকম কাজ শুরু করানো যে কী যাচ্ছেতাই যন্ত্রণা তা ভাবলেই মেজাজ গরম হয়ে যায়। কিন্তু কী করা যাবে, নিজের তো প্রয়োজনীয় সামর্থ্য নেই, সরকারের দরজায় হাত না পেতে উপায় কী। কতগুলো অশিক্ষিত লোকের কব্জায় কি না এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে কি হবে না তা ঠিক করে দেবার ক্ষমতা! কোনো মানে হয়!

হঠাৎ এ বাড়ির নির্দিষ্ট কড়া নিয়ম ভেঙে তাঁর পড়ার ঘরের দরজায় অসময়ে টোকা পড়ল। মহা বিরক্ত হয়ে অজিত বললেন, 'কে? ভেতরে এসো।'

'তোমাকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন,' দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রায়া বললেন, 'বলছি তুমি ব্যস্ত তাও শুনছে না।'

'কী চায় কী লোকটা? বলে দাও, আমি এখন কথা বলতে পারবো না।'

'বলছে কী না কি তোমার ইউনিভার্সিটির কাজের ব্যাপারে একটা জরুরি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। ভাব করছে যেন সরকারি দপ্তরের সাথেও যোগাযোগ আছে। একটু এসে কথা বলে যাও, নাহলে জ্বালিয়ে মারছে আমাকে।'

অজিত উঠে এলেন অগত্যা। বসার ঘরে তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে যে লোকটি উঠে দাঁড়াল তার চেহারাটা মোটাসোটা গোলগাল, পরনে প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট, হাতে একটা ছড়ি, পায়ে চটি। শক্ত সমর্থ চেহারা, তবে বোঝা যাচ্ছে বয়স খুব কম নয়, অন্তত সাতের ঘরে। অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বলে উঠলেন ভদ্রলোক, 'আমি খুব দুঃখিত, অধ্যাপক বোস, এত সকালে আপনার কাজের সময় এসে পড়েছি। কিন্তু, সত্যি বলছি, এখন না এসে আমার উপায় ছিল না, আপনার সম্মতিটা আজ সকালেই দরকার আমার।'

'সম্মতি ? কিসের সম্মতি ?'

'মানে, সেই ভোর থেকেই আপনার পিছনে ঘুরছি। তা, আপনার ব্যায়ামের সময়, কথা বলবো বলবো ভেবেও আর বলা হলো না। তাই এখন এলাম।'

'আপনিই ওই গাড়িটাতে ছিলেন ?' অজিতের বিরক্তি আরও বাড়ে। 'অদ্ভুত ব্যাপার তো! সে যাই হোক, এখন কী চাইছেন বলুন, আমার হাতে সময় নেই, বিশেষ একটা কাজে ব্যস্ত আছি।'

'আজ্ঞে জানি, স্যার। ওই মন্ত্রীর দপ্তরে পাঠাবার জন্যে কাগজপত্র তৈরি করছেন। তা সে ব্যবস্থা হয়ে যাবেখন। এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন। একটু বসি, স্যার ?'

'বসুন, কিন্তু,' ভীষণ আশ্চর্য হয়ে অজিত জানতে চান, 'আপনি জানলেন কী করে আমি কী কাজ করছিলাম এতক্ষণ ? কে আপনি ?'

'জানি স্যার, আমি অনেক কিছু জানি। সব বলছি। আমার নাম ভবতারণ চক্রবর্তি। থাকি কোথায় সেটা সঠিক বলা মুশকিল, কারণ ব্যবসার প্রয়োজনে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে। কাজেই সবখানেই একটা করে ডেরা বানিয়ে রাখতে হয়েছে। যেমন ধরুন, গতকাল আমি কলকাতায় এসেছি ইওকোহামা থেকে। ওখানে আমার একটা ছোট্ট ইলেকট্রনিক কমপোনেন্টের কারখানা আছে তো। এবারে আমার প্রস্তাবটা বলি স্যার ?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান......। আগে বলুন আমার সম্পর্কে আপনি কী কী জেনেছেন? আর কী করেই বা জেনেছেন?'

'আপনার সম্পর্কে সারা দুনিয়ায় ওয়াকিবহাল মহলে কে না সব খবর রাখে! তবে খুঁটিনাটি..... আসলে আমি অনেকদিন ধরেই আপনার সম্বন্ধে জানছি আর কি। মানে, আপনার গবেষণার বিষয়টা আবার আমার খুব প্রিয় বিষয় কি না! আমার লোকজন......পয়সাকড়ি একটু আধটু থাকলে তো লোকবলের অভাব হয় না......আপনার সব কাজকর্মই খুব শ্রদ্ধাসহকারে লক্ষ করে আসছে আর আমাকে খবর দিচ্ছে অনেক দিন ধরে। সব বলছি স্যার, তার আগে, কিছু যদি মনে না করেন, যদি একটু চা.........'

মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠলেও অজিত দরজায় গিয়ে রায়াকে ডেকে বললেন একটু চা জলখাবার নিয়ে আসতে। ফিরে এসে বসতেই ভবতারণ বলতে শুরু করে দিলেন, 'জীবাশ্মবিজ্ঞানী হিসেবে আপনার পৃথিবীজোড়া খ্যাতির কথা তো জানাই ছিল। আপনি কোথায় কোথায় নানাভাবে কাজ করেছেন তাও জানি। সে সব কাজ সম্বন্ধে সব তথ্য আমার নখদর্পণে। ওয়াইওমিং, অ্যারিজোনা আর ইউটাতে কাজ করে আপনি অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীমহলে সোরগোল তুলে দিয়েছিলেন। মন্টানাতে গোটা একটা ভেলোসির‍্যাপটরের কঙ্কাল এবং অজস্র টুকরো হাড় আর নখ আপনি খুঁজে বের করেছিলেন। সেই নখগুলোর মধ্যে একটা বেশ বড়সড় নমুনা তো সব সময় আপনার হাতে থাকে। খানিকটা যেন, যাকে বলে, গুড লাক চার্ম। আপনার কত পেপার যে কত আন্তর্জাতিক জীবাশ্মবিদ সম্মেলনে আপনি পাঠ করেছেন তা আপনি নিজেও বোধ হয় মনে করে বলতে পারবেন না। আমার কাছে কিন্তু তার প্রত্যেকটার অনুলিপি আছে। ভারতেও আপনি কাজ কম করেননি। আমি তো এদেশে বেশ কিছু তাবড় তাবড় লোককে জানি যাঁরা আপনার নাম বললেই হাত তুলে একবার নমস্কার করে নেন। এত অল্প বয়সে এত খ্যাতি খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। বর্তমানে আপনি একটা বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। দক্ষিণ দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী আর মঞ্জীরা নদীর মধ্যবর্তি অঞ্চলে ব্যাপক তল্লাশি চালালে

ডাইনোসরদের জীবন, প্রকৃতি আর বিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যাবে বলে আপনার বিশ্বাস। সমস্যা দেখা দিয়েছে টাকা নিয়ে। অর্থাভাবে এত বড় কাজটা আপনি শুরু করতে পারছেন না। সরকারি দপ্তরের অধস্তন আমলারা আপনাকে ভীষণ ঘোরাচ্ছে। তাই কাগজপত্র হিসেবটিসেব নিয়ে সরাসরি মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। তবে আপনার এও ধারণা যে সেখানে সামনাসামনি আপ্যায়ন পেলেও আদতে কাজ বড় একটা হবে না।'

এরকম আশ্চর্য অজিত জীবনে কখনও হননি। সক্কালবেলা কোত্থেকে এসে লোকটা বলছে কী! অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি কে?'

'আমি একজন সামান্য লোক। নাম তো আগেই বলেছি। এটা ওটা করে কিছু পয়সাকড়ি করেছি। খুব অল্প বয়সে সামান্য লেখাপড়া করে ভাগ্যান্বেষণে চলে গিয়েছিলাম অ্যামেরিকা। সেখানে নানা রকম কাজকর্ম করতে করতে কপাল খুলে গেল। ব্যবসায় বেশ সাফল্য পেলাম। এখন পঁচাত্তর বছর বয়েস হল। বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই আমার নানা রকম কারবার। আমার চেয়ে ধনী লোক দুনিয়ায় আছে নিশ্চয়, তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। শুনে অবাক হচ্ছেন তো? আসলে আমাকে বড় একটা কেউ চেনে না। আমি বরাবরই আত্মপ্রচার অপছন্দ করি।'

ইতিমধ্যে রায়া ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে ট্রেতে চা জলখাবার নিয়ে বাড়ির পুরনো কাজের লোক সম্পত। চা নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে যেতেও স্বামীর মুখের ভাব দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন রায়া। কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।

চা হাতে তুলে নিয়ে ভবতারণ রায়াকে বললেন, 'একটু বসবেন, মিসেস বোস? আপনাকেও দু'একটা কথা বলার আছে আমার।'

অজিতের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন রায়া। ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন অজিত।

'এই ভদ্রলোক আমার প্রায় নাড়িনক্ষত্র জানেন। বলছেন কী একটা ব্যাপারে আমার সম্মতি নিতে এসেছেন।'

'হ্যাঁ, মিসেস বোস, সম্মতি আপনারও চাই। আপনি তো

রীতিমতো নাম করা একজন ফটোগ্রাফার। ভারতে তো বটেই, নিউ ইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অব ফটোগ্রাফিতেও আপনার প্রদর্শনী হয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে সে প্রদর্শনী আমি দেখেও ছিলাম। এই তো, বছর পাঁচেক আগেই তো, আপনি রয়াল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির "ফেলো" হলেন, তাই না?'

এবার অবাক হওয়ার পালা রায়ার। আপাদমস্তক দেখলেন তাকিয়ে লোকটিকে। প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল ভবতারণের হাতের ছড়িটার দিকে। বেতের ছড়িটার হাতলে বসানো রয়েছে সুন্দর করে পল কাটা একটা বেশ বড় স্ফটিকখণ্ড। সকালের আলোয় ঝকঝক করছে স্ফটিক আর তার একদম ভিতরে কালো মতো কী যেন একটা আবছা দেখা যাচ্ছে। কৌতূহল হলেও কোনো প্রশ্ন করলেন না রায়া।

'এবারে আমার প্রস্তাবটা বলি,' বলে চললেন ভবতারণ, 'আন্দামানে রাটল্যান্ড আইল্যান্ড থেকে দক্ষিণে ডানকান প্যাসেজের দক্ষিণপূর্ব এলাকায় ভারত সরকারের কাছ থেকে জনবসতিহীন একটা দ্বীপ আমার ইজারা নেওয়া আছে। সেই দ্বীপে আমি একটা নতুন ধরনের চিড়িয়াখানা বানিয়েছি অনেক দিন ধরে, অনেক খরচ করে। সেই চিড়িয়াখানা আপনারা দু'জনে দেখতে আসবেন আমার সাথে।'

'অসম্ভব। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। তাছাড়া, যত ভালোই হোক, চিড়িয়াখানা দেখায় আমার কোনো আগ্রহ নেই। তায় আবার অতদূর।'

'একটু আমার কথা যদি শোনেন স্যার। এক তো এই চিড়িয়াখানা দেখে আপনি একদম তাজ্জব বনে যাবেন। আর তাছাড়া আপনার মতামতটা না পেলে যে আমি ওটা জনসাধারণের জন্যে খুলতে পারছি না। দেশবিদেশ থেকে ট্যুরিস্ট আসবে, ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা আসবে প্রচুর। আর মিসেস বোস, আপনি যা ছবি তোলার বিষয় পাবেন তা ভাবতেও পারছেন না। কী লেনস নেবেন তা তো বলার কিছু নেই আপনাকে, তবু বলি বেশি করে ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনস নেবেন সাথে। আর খরচ-খরচা সব আমার। এখান থেকে পোর্ট ব্লেয়ার আমার নিজস্ব জেটে, সেখান থেকে হেলিকপটার,

সেটাও আমারই। সময় ধরুন যাওয়া ঘোরা ফেরা সব মিলিয়ে লাগবে দিন তিন চার। দেখবেন স্যার, গেলে আপনার ইচ্ছে করবে আরও ক'দিন থাকতে।'

প্রস্তাবটা রায়ার খারাপ লাগছিল না। আন্দামান ঘোরাও হবে, অজিতও একটু ছুটি পাবেন। বড্ড খাটাখাটনি যাচ্ছে ওঁর। কলকাতায় থাকলে কথা শোনার পাত্র নন, বিশ্রাম নিতে চান না একদম। কিন্তু অজিত আবার বললেন, 'না, না। প্রশ্নই ওঠে না। দিল্লি যাওয়া আমার অনেক বেশি দরকার। আর এই হিসেবপত্র করতে গিয়ে কাজেরও অনেক ক্ষতি হয়েছে আমার। এখন কোথাও যাওয়া যাবে না।'

'আর একটু শুনুন স্যার।' পকেট থেকে সযত্নে কী একটা কাগজ বার করেন ভবতারণ। 'বলেছি তো, আমার টাকার অভাব, আপনাদের শুভেচ্ছায়, একেবারেই নেই। আর, পঁচাত্তর বছর বয়স হল, থাকার মধ্যে মেয়ে, এক নাতি আর এক নাতনি। আমার টাকা আমি বিজ্ঞানের স্বার্থেই ব্যয় করব। করেওছি এতদিন। এই একটা সই করা চেক, টাকার অঙ্কটা বসানো নেই। আপনার দাক্ষিণাত্য অভিযানের জন্যে যা কিছু খরচ লাগবে, লোকজনের বেতন, যানবাহনের খরচ, খাওয়াদাওয়ার খরচ, দরকারি যন্ত্রপাতির দাম, মায় অভিযানের আবিষ্কৃত তথ্য ছাপার খরচ, সব আমি দেব। এই চেকে ফাঁকা জায়গায় টাকার অঙ্কটা শুধু বসিয়ে নেবেন স্যার। এই দু'তিনটে দিন আপনারা যে কষ্ট করবেন তার জন্যে আমার তরফ থেকে এ ধরুন সামান্য একটু দক্ষিণা। দোহাই স্যার, না বলবেন না।'

ষড়যন্ত্র

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাঞ্জাবি রেস্তরাঁ 'ধাবা'। তার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল একজন মধ্যবয়সী শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি। কাঁধে ঝুলছে একটা চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগটা যে যথেষ্ট মূল্যবান তা দেখলেই বোঝা যায়। লোকটির পরণে একটা জীনস্ আর হাফ হাতা শার্ট। চোখে সানগ্লাস। কিন্তু তার ডান হাতে যে পেটমোটা ব্রীফকেসটা ঝুলছে সেটা একেবারেই খেলো। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত কৌতূহলী পথচারীদের দেখে নিল লোকটি। তার স্বভাবত উদ্ধত মুখের ভাব আরও বিকৃত হল তাচ্ছিল্যে।

একধাপ এগিয়ে রেস্তরাঁয় ঢোকার মুখেই অপ্রত্যাশিত অতিথিকে স্বাগত জানাতে কাউন্টার ছেড়ে উঠে এলেন সর্দারজি। কিন্তু সেদিকে একটুও দৃকপাত না করে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে ঘরটাতে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজল লোকটি। তারপর মুখেচোখে তার বিতৃষ্ণা জেগে ওঠা দেখে বোঝা গেল, যাকে খুঁজছে তাকে সম্ভবত দেখতে পেয়েছে সে।

বিতৃষ্ণা হওয়ারই কথা। বিদেশী লোকটি যে-টেবিলটার দিকে এগোল এবার, সেটাতে বসে আত্মহারা হয়ে খেয়ে চলেছে এক বিপুলকায় ব্যক্তি। এই রকম মোটা লোক বড় একটা দেখা যায়

না। রোদে-পোড়া তামাটে গায়ের রং। নাকের তলায় হাস্যকর এক জোড়া যত্নে ছাঁটা সরু গোঁফ। সারা কপালে ঘাম। চোখে চশমা। সমগ্র সত্তা নিমজ্জিত টেবিল ভর্তি খাবারে। গোটা দশেক প্লেট সামনে। একটাতে স্তূপিকৃত চিবোনো হাড়। এই মুহূর্তে লোকটা দু'হাতে একটা তন্দুরি মুরগির টুকরো ধরে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছে। মুখের চারপাশে চর্বি আর ঝোলের চিহ্ন। গলায় ন্যাপকিন গোঁজা থাকা সত্ত্বেও জামায় বিভিন্ন খাবারের ছিট ছিট নতুন পুরনো দাগ।

উল্টো দিকের চেয়ারে ধপ করে হাতের ব্রীফকেস রাখল বিদেশী লোকটি। এবার মুখ তুলে তাকাল স্থূলাঙ্গ। এক গাল হেসে বলে উঠল ইংরেজিতে, 'এসো এসো সাহেব, এসে গেছ? বসো।' কথার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে ছিটকে বেরোলো অর্ধচর্বিত মাংসের লালা মিশ্রিত কুচি। 'খাবে না কি কিছু?'

কোনোরকমে নিজেকে সামলে যতটা সম্ভব পিছিয়ে বসল বিদেশী। বলল, 'একটু ভদ্রলোকের মতো খেতে পার না?'

'আরে ছাড়ো ওসব ভদ্রতা। খিদে পেয়েছে। খাচ্ছি। তা মিঃ ডা—'

'চুপ করো। কোন নাম করবে না।'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। তা আমার নাম তুমি স্বচ্ছন্দে করতে পার। আমি কাউকে ডরাই না। চেঁচিয়ে বলতে রাজি আছি, আমার নাম সুবোধ প্রামাণিক।' বলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। হাসির দমকে থলথলে শরীরটা কাঁপতে থাকল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, 'এনেছো, যা আনার কথা?'

'এনেছি।'

ব্রীফকেসটা হাতে দিতেই একটু ফাঁক করে ভেতরটা দেখে নিল সুবোধ নামধারী ব্যক্তিটি। আবার সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল, কষ বেয়ে গড়াল একটু লালা।

'পুরো পাঁচ লাখ আছে। গুণে নেবে না?'

'আরে ছ্যা ছ্যা! তোমাকে পুরো বিশ্বাস করি আমি। ভরোসা হ্যায় তুমহারা উপর। আর তাছাড়া, সাহেবনন্দন, আমাকে ঠকালে তুমি নিজেই ঠকবে। বাকিটা দেবে কবে?'

'কাল রাত্রে তোমাদের ছোট জাহাজঘাটের ঠিক বাইরে আমাদের ট্রলার অপেক্ষা করবে। জিনিসগুলো নিয়ে সময় মতো পৌঁছে যেও। পর পর তিনদিন অপেক্ষা করবে আমার লোক। মাল হাতে পেলেই বাকিটা পেয়ে যাবে। আর যদি না আসো, তাহলে আর কিছু তো পাবে না-ই, প্রাণটাও খোয়াতে পারো।'

কথাটা বলে ব্যাগ থেকে একটা লম্বা কৌটো বার করল মিঃ ডা—। ঢাকনা খুলতে দেখা গেল একটা স্প্রে মতো জিনিস। উপরের ছিপিতে চাপ দিতেই এক দলা সাদা মতো কী যেন ফেনিয়ে পড়ল সুবোধের সামনের প্লেটে।

'এ আবার কী?'

'আঙুলে করে চেখে দেখ।'

'ওয়াক থুঃ, এতো শেভিং ক্রীম।'

'হ্যাঁ, ক্রীম। কৌটোর গায়েই তো লেখা রয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার অন্য।' বলে, কৌটোটার উপরের অংশটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে ফেলল লোকটা। বেরিয়ে পড়ল গোল একটা বুড়ো আঙুল সমান ডাঁটির চারপাশে কতগুলো ফুটোওয়ালা তাক। আঙুল ঢোকার মতো প্রশস্ত এক একটা ফুটো।

'বুঝতে পারছ, কীভাবে মাল পাচার করবে?'

'বুঝেছি। বুদ্ধি আছে তো বেশ তোমাদের।'

ঠাট্টায় কান না দিয়ে আবার প্রশ্ন করল মিঃ ডা—, 'কী কী চাই, মনে আছে?'

'আছে, আছে, ঘাবড়িও না।'

'এর ভেতরেই মাল ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা আছে। সব হাতাবার পর যা করার করবে। কোনো রকম ফাঁক যেন না থাকে।' কথাটা বলেই সটান উঠে পড়ল লোকটি। এই কুৎসিত মাংসপিণ্ডের সামনে তার আর এক মুহূর্তও বসে থাকতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

একই রকম হাসিমুখে লোকটির অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল সুবোধ প্রামানিক। লোকটির খোলাখুলি প্রকাশিত ঘৃণাতে তার কিছু এসে গেল বলে মনে হল না একটুও। কয়েক বার ব্রীফকেসটার উপর বাঁ হাত বোলাল সুবোধ। 'এবারে দেখা যাবে কে কাকে ঘেন্না করে, পয়সা হাতে থাকলে সব ঘেন্নাই ভালবাসায়

পরিণত হবে। আর ভবতারণ চক্কোত্তি.... দেখাবো তোমাকে মজা!' মনে মনে এই কথাগুলো উচ্চারণ করে আবার মুরগির মাংসে মনোযোগ দিল সে। 'দুত্তোর! ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' বেয়ারাকে ডেকে আর এক প্রস্থ অর্ডার দিয়ে তারপর খড়কে কাঠি সহযোগে দাঁত খুঁচিয়ে মাংসের কুচি বের করে সেগুলো ফের চিবোতে লাগল সুবোধ প্রামাণিক।

এও কি সম্ভব?

হেলিকপটার থেকে প্রথমে নামলেন ভবতারণ। পিছনে পিছনে পর পর রায়া, অজিত, রাকেশ এবং চার্লস। হেলিপ্যাডটার পাশেই একটা জলাশয়। তাতে এসে পড়ছে ওপাড়ের টিলাটার উপর থেকে একটা ছোটখাট ঝর্ণা। জলাশয় থেকে আবার দুটো খালের মধ্যে দিয়ে জলস্রোত দু'দিকে প্রবাহিত হয়ে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও হারিয়ে গেছে। সকাল তখন ন'টা।

রায়া ভাবতেই পারছিলেন না, মাত্র গতকালই ভবতারণ চক্রবর্তি তাঁর আশ্চর্য প্রস্তাব নিয়ে ঢুকেছিলেন তাঁদের বাড়ি। দু'তিনটে দিন আন্দামানের মতো চমৎকার জায়গায় কেবল বেড়াতে গেলেই যদি দাক্ষিণাত্য অভিযানের খরচ উঠে যায় তো মন্দ কী! এই ভেবে শেষ পর্যন্ত ভবতারণের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন অজিত। তারপর গোছগাছ করে তৈরি হয়ে নিতে সময় খুব বেশি লাগেনি। ভবতারণেব বক্তব্য স্মরণ করে রায়া নেব না নেব না করেও শেষ পর্যন্ত আলাদা আলাদা ফোকাল লেংথের দুটো সুপার ওয়াইড লেনস সঙ্গে নিয়েছেন। আর নিয়েছেন একটা ফাইভ হানড্রেড মিলিমিটার 'ক্যাট' লেনস, শর্ট জুম লাগানো দুটো থার্টি ফাইভ ক্যামেরা বডি। অজিত নিয়েছেন তাঁর ল্যাপটপ কমপিউটার,

ইলেকট্রনিক নোটবুক, আর তাঁর নিত্যসঙ্গী ভেলোসির‍্যাপটরের নখ — যাকে রায়া বলেন অজিতের 'পাদুলি'। জামা কাপড়ের ব্যাপারে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী কখনই খুঁতখুঁতে নন। অজিতের সার্টপ্যান্ট দুই-ই ডেনিম কাপড়ের। রায়ার প্যান্টও তাই, তবে সার্টটা কচি কলাপাতা রঙের টেরিকটনের। সঙ্গে আছে আর এক প্রস্থ পোশাক আর দু'দিনের মতো অন্তর্বাস।

কাজেই পরদিন সকালে অন্ধকার থাকতে থাকতেই যখন গাড়ি এল ওঁদের তুলে নিতে তখন দু'জনে ধীরে সুস্থেই রওনা দিলেন। বাড়ি বন্ধ করার কিছু নেই। সম্পত তো রইলই।

এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিলেন ভবতারণ। ওঁদের দেখে হাসিমুখে বললেন, 'আসুন অধ্যাপক বোস, আসুন মিসেস বোস। বড্ড সকালে টানাটানি করলাম। আসলে, চাইছি খুব সকালেই পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছে যেতে। আর ভোরবেলা ফ্লাইট প্ল্যান ক্লিয়ারেন্স পেতেও সুবিধে হয়। আমাদের সাথে আরও দু'জন ভদ্রলোক যাবেন, এখুনি এসে পড়বেন। আপনাদের মতো ওঁদের কাছ থেকেও আটচল্লিশ ঘন্টা সময় নিয়েছি।'

'আপনার চিড়িয়াখানা সম্পর্কে এখনও কিছু বলবেন না?' প্রশ্ন করেন রায়া।

'একটু ধৈর্য ধরুন। আর ঘন্টা চারপাঁচ।' হাসেন ভবতারণ, 'শুধু এইটুকু বলি, আমার চিড়িয়াখানায় সব সরীসৃপ, একটাও স্তন্যপায়ী নেই।'

'কলকাতা চিড়িয়াখানার "রেপটাইল হাউস"-এর মতো?' অজিত একটু বাঁকা হাসেন।

'তা বলতে পারেন।'

ইতিমধ্যে এসে পড়লেন রাকেশ পাণ্ডে, আর চার্লস মারিনেত্তি। ভবতারণ পরিচয় করিয়ে দিলেন, রাকেশ পাণ্ডে রয়টারের ভারতীয় দপ্তরের প্রধান এবং চার্লস মারিনেত্তি এসেছেন অ্যামেরিকা থেকে, তিনি সে-দেশের একটা ব্যবসায়িক সংস্থার অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা এবং পর্যটন বিশেষজ্ঞ। দু'জনেই ভবতারণের অতিথি হয়ে এসেছেন।

প্লেনে বসে ভালো করে আলাপ হল ওঁদের সঙ্গে। অজিত কথা বেশি বলেন না, রায়াই আলাপ করলেন। কথা শুনে বোঝা

গেল, রাকেশও খানিকটা বড় লোকের খেয়াল চরিতার্থ করতে আর মুফত বেড়াবার লোভে এসেছেন। তবে চার্লস কোন রকম ভাবে মুনাফার গন্ধ না পেলে আসতেন না। তাঁর সঙ্গে ভবতারণের যে পুরনো আলাপ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না ওঁদের সহজ সম্পর্ক দেখে।

চার্লসকে রায়া বা অজিত কারোরই খুব পছন্দ হল না। লোকটির কোথায় যেন একটা কেমন গণ্ডগোল আছে একটু বেশি আত্মসচেতন। মাথার টাক ঢেকে রেখেছেন পিছনের চুল দিয়ে। হাবেভাবে কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম অশিক্ষার ছাপ, কথা শুনলে মনে হয় ধরাকে সরা জ্ঞান করাটাই ওঁর অভ্যাস। অজিতের বিস্তারিত পরিচয় শুনে ভদ্রতাসূচক একটা 'ও, আচ্ছা' বললেও বোঝাই গেল অজিতের নাম এই প্রথম শুনলেন ভদ্রলোক। অন্যদিকে রাকেশকে রায়ার—এবং অজিতেরও—বেশ পছন্দ হল। খোলামেলা আমুদে ছেলে। বয়েস হবে বড়জোর পঁয়ত্রিশ, ইতিমধ্যেই সাংবাদিক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি। দিব্যি বাংলা বলেন, অজিতের কাজকর্মের সঙ্গে তিনি ভালোই পরিচিত। ফটোগ্রাফার হিসাবে রায়াকেও তিনি আগে থেকেই জানেন। রায়াকে 'ভাবী' বলে ডেকে দিব্যি জমিয়ে গল্পে মেতে গেলেন পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই। ওঁর কাছেই জানলেন রায়া, ভবতারণ ওঁকেও একই রকম হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে ধরে নিয়ে এসেছেন। অবশ্য পৃথিবীর অন্যতম ধনকুবের ও শিল্পপতি ভবতারণ রাকেশের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। চার্লস মারিনেত্তির সঙ্গে কোনো একটা ব্যবসায়িক চুক্তি হতে যাচ্ছে, এ খবরও রাকেশই দিলেন। মজা করে ভুরু নাচিয়ে ইশারায় বললেন, কিছু একটা গোলমাল আছে লোকটার। চার্লস নিতান্ত পোশাকি দু'চারটে কথা ছাড়া কিছু বললেন না। অনেকটা সময়ই ভবতারণের সঙ্গে নিচু গলায় কিছু আলোচনা চলল ওঁর।

একজন সুবেশ হাস্যোজ্জ্বল যুবক সকলকে প্রাতরাশ পরিবেশন করল। ভবতারণ অতিথিদের আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখলেন না আচারে ব্যবহারে। যথা সময়ে পোর্ট ব্লেয়ারে নামল প্লেন। একটুও সময় নষ্ট না করে হেলিকপটারে উঠলেন সকলে। অবিশ্বাস্য নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলল হেলিকপটার। রায়া ক্যামেরা

বার করেই বসেছিলেন। সোজা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উড়ে চলেছেন তাঁরা। সকালের সূর্য চোখ ধাঁধানো আলোর কার্পেট বিছিয়েছে তাঁদের যাত্রাপথের বাঁদিকে। ছবি তোলা যাচ্ছে না। প্রচুর জেলে নৌকো আর ট্রলার দেখা যাচ্ছে জলে। চলেছে গভীর সমুদ্রের দিকে। কিন্তু সবই গলানো রূপো ঢেলে দেওয়া জলের উপর কালো কালো শিল্যুট। খানিকবাদে রাটল্যান্ড আইল্যান্ড পেরিয়ে যাবার পর হেলিকপটার মুখ ঘোরালো সোজা দক্ষিণ দিকে। এতক্ষণে প্রতিফলিত আলোর প্রাবল্য কিছু কমল। রায়ার ক্যামেরা সচল হল এবার।

ভবতারণ বোধ হয় পাইলটকে বলেই রেখে ছিলেন। যাত্রী কামরায় মুখ বাড়িয়ে সে কী যেন বলল। ভবতারণ রায়াকে বললেন ককপিটে যেতে। শব্দের চোটে শোনা যাচ্ছে না কিছু। সামনে ডানদিকে তাকালেন রায়া পাইলটের ইশারায়। চোখে পড়ল এক আশ্চর্য দৃশ্য। একদল ডলফিন ভোরের রোদে খেলা করছে। কেউ জল থেকে লাফিয়ে উঠছে, কেউ শরীরটাকে ঢেউ-এর মতো সামনে পিছনে আন্দোলিত করছে। গায়ে সূর্যের আলো পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বেশি কাছে যাওয়া যাবে না, ডুব দেবে ওরা, পাইলট জানায়। রায়া ঝটিতি তাঁর 'ক্যাট' লেনস লাগিয়ে ছবির পর ছবি তুলতে লাগলেন। অবশ্য সময় পেলেন মাত্র মিনিট পাঁচেক। তারপরই ওদের পিছনে ফেলে চলে যেতে হল। সময় নেই এখন। মনে মনে ভেবে রাখলেন রায়া, ফিরতি পথে ভবতারণকে বলে আরও খানিক সময় ছবি তোলার আয়োজন করতে হবে সমুদ্রের বুকে।

ফিরে এসে রায়া দেখলেন, অজিতের সঙ্গে চার্লসের খুব উত্তেজিত আলোচনা চলছে। প্রশ্রয়ের হাসি মুখে নিয়ে ভবতারণ তাকিয়ে আছেন ওঁদের দিকে। তর্কের শেষ ভাগ শুনে এটুকু শুধু বোঝা গেল যে চার্লসের বক্তব্য হল সরাসরি ব্যবহারিক মূল্য নেই এমন কোন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের কোন মানেই হয় না। এসব কাজে টাকা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কেই ঢালতে হয়, সুতরাং তাদের দিকটাই বিজ্ঞানীদের প্রথম দেখা উচিত। অজিত যথারীতি ক্ষেপে গিয়ে বলছেন, নিজের নাকের ডগা থেকে বেশি দূর যাদের দৃষ্টি যায় না তারা বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তিগত ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে

কিছু বুঝতেই পারবে না। গবেষণার স্বাধীনতা যদি বৈজ্ঞানিকের না থাকে তাহলে সবটাই দোকানদারিতে পরিণত হবে।

রাকেশ অসহায় মুখে বসে কথা শুনছিলেন। হাত উল্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছদ্মবিরক্তি সহকারে রায়াকে বললেন, 'এঁদের কথাবার্তা বড্ড রাশভারি, ভাবী। কিচ্ছু বুঝি না। কেমন ছবি তুললেন, তাই বলুন।'

'দারুণ।'

'ওই দেখুন, দূরে ডানদিকে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। ওটাতেই নামবো নাকি আমরা?'

তার কথা শেষ হতে না হতেই কাত হয়ে বাঁ দিকে ঘুরল হেলিকপটার। ক্রমশ উচ্চতা কমাতে কমাতে প্রায় নিস্তরঙ্গ ঘন নীল জলের বুকে বিলি কাটতে কাটতে সেই দ্বীপটার দিকেই চলল উড়ে।

দ্বীপটার চারপাশে সমুদ্র তরঙ্গমুখর। কিন্তু তার খানিক আগে জল শান্ত, হালকা সবজেটে নীল। তলায় সাদা বালি দেখা যাচ্ছে। সেই জলে কাঁপন তুলে অল্প উচ্চতায় হেলিকপটার দ্বীপটা প্রদক্ষিণ করছে। কারণ বোঝা যাচ্ছে সহজেই। সরু ফালি বেলাভূমির পরেই খাড়া সবুজে ঢাকা পাহাড় উঠে গেছে। দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পৌঁছে দেখা গেল অপ্রশস্ত গিরিখাত। তারই ভিতর দিয়ে দ্বীপের অভ্যন্তরের দিকে চলল এবার হেলিকপটার।

দু'পাশে সবুজ দেওয়াল। বাতাসে বেশ আলোড়ন। তার ধাক্কায় বার কতক কপটার লাফাল। সাবধান হতে কোমরে সিট বেল্ট বেঁধে নিলেন সবাই। এবার হেলিকপটার নামতে লাগল মাটির দিকে। সামনে উপত্যকায় ঘন জঙ্গল। ঝকঝকে রোদ্দুর।

'এসে গেছি আমরা। একটু পরেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন সবাই।'

'বেশ সুন্দর তো জায়গাটা, কিন্তু—', চার্লসের কণ্ঠস্বরে সন্দেহ, 'এমন জায়গার অভাব দুনিয়ায় নেই। চাইলেই ডজন ডজন পাওয়া যাবে। আমরা কেন আগ্রহী হব এখনও বুঝলাম না।'

'বুঝবে, বুঝবে। আর মিনিট পনেরো যেতে দাও।'

ইতিমধ্যে দু'টি জিপ এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় কোন ছাউনি

নেই। সাদা রং। দরজার পাল্লার গায়ে একটা ডাইনোসরের ছবি আর ছবির উপরে আড়াআড়িভাবে বড় হরফে লেখা 'ডাইনোসর পার্ক'।

প্রথম জিপে উঠলেন চালকের পাশে রায়া, পিছনে অজিত আর রাকেশ। দ্বিতীয় জিপে সামনে চার্লস আর পিছনে ভবতারণ এবং আরেকজন লোক। বোঝাই গেল এখানকার কর্মচারী। উঠেই সে ভবতারণকে নিচু গলায় কিছু বলতে লাগল। তার কথা শুনতে শুনতে ভবতারণের মুখে ফুটে উঠল খুশির হাসি।

রওনা হল জিপগুলো দ্বীপের অন্দর মহলের দিকে। সোজা পাকা রাস্তা মিনিট খানেকের মধ্যে ডান দিকে বাঁক নিল। মুখ ঘুরিয়ে চার্লস বলে উঠলেন, 'মনে রেখো ভবতারণ, আমি ব্যস্ত লোক, এসেছি তোমার ব্যবসায়ী বুদ্ধির উপর নিছক আস্থা আছে বলেই। সময় দিলাম আটচল্লিশ ঘন্টা। এর মধ্যে আমাকে চমকে দেবে এবং টাকা ঢালতে রাজি করাবে। আমি রাজি হলে আমার উপরওয়ালারা রাজি হবে! তখন শুনবো তোমার প্রস্তাব।'

হো হো করে হেসে উঠলেন ভবতারণ। বললেন, 'শোন হে চার্লি, আটচল্লিশ ঘন্টা পরে তুমি আমার হাতে পায়ে ধরবে টাকা ঢালবার সুযোগের জন্যে।'

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল উঁচু কাঁটা তারের বেড়া। কাছে এসে দেখা গেল, কংক্রিটের বারো চোদ্দ ফুট উঁচু দেওয়ালের উপরে সারি সারি লোহার রডে বাঁধা দশ লাইন তারের বেড়া। প্রত্যেকটা তারের মধ্যে দেড় ফুট মতো ফাঁক। প্রত্যেক পঞ্চম রডের মাথায় একটা করে লাল আলো জ্বলছে। রডগুলো আবার ভিতর দিকে দু'ফুট করে বাঁকানো, সেখানেও তার লাগানো রয়েছে একই ভাবে। রাস্তা এসে থেমেছে একটা লোহার জালের দরজার সামনে। ভিতরে দেখা যাচ্ছে আরেকটা একই রকম দরজা। উপরে লেখা 'সাবধান!' তার নিচে মরার খুলি আর গুণচিহ্নের মতো হাড়ের ছবি। তার নিচে চারটি ভাষায় লেখা 'তড়িৎ সঞ্চারিত বেড়া : দশ হাজার ভোল্ট'।

জিপ দুটো এসে দাঁড়াতেই দরজার উপরের লাল আলো নিভে গেল। ভিতরের একটা পোক্ত কংক্রিটের ঘরের ভিতর থেকে দু'জন

লোক বেরিয়ে এসে একটা একটা করে দরজা খুলে দিল। জিপ ঢুকে যেতে মুখ ঘুরিয়ে অজিত দেখলেন, দরজা আবার বন্ধ করে দেওয়া হল এবং লোক দু'জন ঘরটার ভিতর ঢুকতেই ক্ল্যাক্সন বিকট শব্দ করে উঠল। দরজার মাথায় আবার জ্বলে উঠল লাল আলো।

তারপর রাস্তা চলল সোজা। দু'ধারে গাছের সারি। বাঁদিকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে ফাঁকা ঘাসজমি। তার মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো কিছু গাছ। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। নির্মেঘ নীল আকাশ। দিনটা খুব চমৎকার কাটবে। রায়ার খুব ভালো লাগছিল। সামনে ড্যাশবোর্ডের পাশে একটা খোপ। সেখান থেকে উঁকি মারছে কতগুলো প্রচার পুস্তিকা। তারই একটা টেনে নিয়ে চোখ বুলোতে শুরু করলেন তিনি। মলাটের উপরে জিপের গায়ের মতো একই কায়দায় লেখা রয়েছে 'ডাইনোসর পার্ক'। প্রথম পাতাটায় একটা রংচঙে নকশায় দেখানো রয়েছে ডাইনোসরদের বিবর্তনের কাহিনী। তারপরের পাতা থেকে এক একটা করে ডাইনোসর প্রজাতির বর্ণনা রয়েছে আর তার সঙ্গে ছবি। রায়ার দক্ষ চোখে ধরা পড়ল, ছবিগুলো সবই আলোকচিত্র এবং অত্যন্ত পেশাদারি মাত্রার কাজ সেগুলো। প্রথমেই একটা টিরানোসরাসের ছবি। আশ্চর্য প্রাণবন্ত লাগছে সেটাকে। মনেই হচ্ছে না যে নিছক একটা মূর্তির আলোকচিত্র। কয়েকটা পাতা উল্টেই চোখে পড়ল একটা আরকেঅপটেরিকসের ছবি, একটা গাছের গা বেয়ে উঠছে। ছবিগুলোর সঙ্গে দেওয়া বিবরণ আরও চাঞ্চল্যকর। যে সব খুঁটিনাটি তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তা জীবিত ডাইনোসরদের চাক্ষুস না দেখে বলার জন্যে মস্তিষ্কের যে-উর্বরতা লাগে তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বড় একটা থাকতে পারে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক অজিত বোসের ঘরণী হিসাবে ডাইনোসরদের সঙ্গে তাঁরও পরিচয় তো খুব কম নয়।

অজিতের এসব দিকে কোন খেয়াল নেই। খুব একটা প্রকৃতিপ্রেমী তিনি কোনদিনই নন। ছুটি কাটাবার জন্যে আধুনিক প্রমোদ উদ্যানে বেড়ানোর চাইতে সে সময়টা লাইব্রেরিতে ব্যয় করাটা তাঁর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি এখানে

আসার সিদ্ধান্তের জন্যে অনুশোচনা করছেন। তার উপরে আজ সকালে অভ্যস্ত দৌড় সম্ভব হয়নি। প্রাতরাশ হজম হচ্ছে না যেন। একটু ঘুম পাচ্ছিল অজিতের। আবহাওয়াও অতি চমৎকার। জিপটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে ঝিম ধরা ভাবটা কেটে গেল। বাঁ চোখের কোণা দিয়ে রাস্তার পাশে কিছু একটা নড়তে দেখে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন অজিত। যা দেখলেন তাতে, আক্ষরিক অর্থে তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল, ঠিকরে বেরোতে চাইল চোখের মণি। আসন ছেড়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক অজিত বোস।

রায়া তখন প্রচার পুস্তিকা থেকে পাঠ করে রাকেশকে শোনাচ্ছেন, 'জুরাসিক যুগে সব চাইতে ভয়ঙ্কর ডাইনোসরাস ছিল টিরানোসরাস। সে ছিল—'

কথা শেষ করার আগেই ডান হাত বাড়িয়ে রায়ার মাথা ধরে মুখ ঘুরিয়ে ধরলেন অজিত। রায়ার প্রতিবাদ অস্ফুটই থেকে গেল। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোলো না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বিস্ফারিত নয়নে। অসম্ভব! হতেই পারে না!

ব্র্যাকিওসরাস

রাস্তার পাশে গাছের সারিতে খানিকটা ফাঁক। সেখানে দেখা যাচ্ছে গজেন্দ্রগমনে হেঁটে চলেছে এক বিশালদেহী প্রাণী। শুধু বিশাল বললে বোধ হয় ভুলই করা হবে, কেননা এই জীবটির মাথা রয়েছে মাটি থেকে পয়তাল্লিশ ফুট উপরে আর দেহের ওজন হবে কমপক্ষে আশি টন। কোমরের থেকে কাঁধের কাছটা অনেক উঁচু। থামের মতো চারটি পা। লেজটা মোটা থেকে সরু হয়ে গেছে। গায়ের রং অপরিচ্ছন্ন খয়েরি। সামনের পা থেকে পিছনের পা পর্যন্ত বুকের উপর চওড়া একটা জায়গা জুড়ে রং অপেক্ষাকৃত হালকা। তার বিশাল দেহের পাশে হাতিও নিতান্ত শিশু।

চলতে চলতে গলা বাড়িয়ে গাছের পাতা আর ডাল ছিঁড়ে খাচ্ছে সেই মহাকায় দানব। প্রায় প্রস্তরীভূত অজিত আর রাম্নার চোখের সামনে, অতি ধীর গতিতে এগোতে এগোতে হঠাৎ বিরক্তিতে আকাশফাটা ডাক ছেড়ে লেজে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে পিছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল সেই জীব। সামনের গাছটার মগডালে তার নাগাল পৌঁছচ্ছিল না। এবারে কচি ডাল আর পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আবার চার পায়ে নেমে দাঁড়াল সে।

হতচকিত, বিস্মিত, বাক্যহারা অজিত এতক্ষণে বাকশক্তি ফিরে

পেলেন। ‘ডাইনোসর!’ তাঁর গলা কাঁপছে।

রায়া তখনও কথা বলতে পারছেন না। কেবল মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

রাকেশ এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেলেন। বলে উঠলেন, ‘কী সাংঘাতিক কান্ড রে বাবা।’

চার্লস এতক্ষণ ইষ্টনাম জপ করছিলেন। এইবার তাঁর হিসেবি মাথা চালু হল পুনরায়। ‘খনি! সোনার খনি হবে এ জায়গাটা।’

জিপ থেকে নেমে দাঁড়ালেন অজিত। রায়ার ক্যামেরা চলতে শুরু করেছে ততক্ষণে। ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেনস সত্যিই লাগবে এখানে ছবি তুলতে। রাকেশও নেমে এসেছেন। চার্লস নামতে ঠিক ভরসা পেলেন না, ভবতারণের অভয়দান সত্ত্বেও।

মাটিতে নেমে ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন ভবতারণ। অজিত রায়াকে বললেন, ‘তুমিও ঠিক দেখছো তো? মাথা ঠিক আছে আমাদের?’

‘হ্যাঁ, অধ্যাপক বোস’, ভবতারণ উত্তর জুগিয়ে বলেন, ‘মাথা চোখ সব ঠিকই আছে। কোনো ফক্কিকারি নেই, কোন ম্যাজিক নেই। সামনে দেখছেন জলজ্যান্ত আগমার্কা ব্র্যাকিওসরাস।’

‘কী করে—?’

‘কেবল একটাই নয়, এরকম আরও অনেকগুলো ব্র্যাকিওসরাস আছে, আছে আরও অনেক কিছু। সব ক্রমশ প্রকাশ্য।’

‘ডাইনোসর পার্ক নামটা তা হলে শুধু চমক নয়? সত্যিই এখানে—’

‘হ্যাঁ, সত্যি।’

মাথাটা ঘুরে উঠল অজিতের। রায়া তাড়াতাড়ি ধরলেন তাঁর কাঁধ।

ওদিকে ব্র্যাকিওসরাস এগিয়ে গেছে বেশ খানিকটা। পরম গর্বভরে ভবতারণ বলে উঠলেন, ‘দেখুন, ওই দেখুন দূরে, দেখুন আমার চিড়িয়াখানা, আমার “ডাইনোসর পার্ক”।’

মুখ তুলে তাকালেন অজিত। মাঠটা শেষ হয়ে একটু দূরেই ঢাল নেমে গেছে। সেই দিকে, অনেকটা দূবে, দেখা যাচ্ছে একটা জলাভূমি, তার পিছনে আবার শুরু হয়েছে বড় বড় গাছের বন।

সেই জলা থেকে উঠে হেলতে দুলতে ডাঙার দিকে এগোচ্ছে একটা ব্র্যাকিওসরাস। আর একটা বসে আছে জলে গা ডুবিয়ে। একপাশে মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে একদল প্যারাসরোলোফাস। বনে এক গাছ থেকে অন্য গাছে বাতাসে গা ভাসিয়ে চলে গেল যে-প্রাণীটি সেটিকে স্পষ্ট না দেখা গেলেও বুঝতে অসুবিধা হল না যে সেটা একটা আরকেঅপটেরিকস্।

রাকেশ সাংবাদিক। বয়েস কম হলেও অভিজ্ঞতা তাঁর কম নয়। সব কিছু সম্পর্কে সাংবাদিকসুলভ একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখানো তাঁর স্বভাব। দুনিয়ায় সব যেন তাঁর দেখা হয়ে গেছে। কিছুই তাঁকে আশ্চর্য করতে পারে না আর। কিন্তু চোখের সামনে এমন একটা প্রাণীকে দেখে তিনিও প্রথম চোটে একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলেন। এইবার তাঁর খবরসন্ধানী নাক সজাগ হল। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন দুনিয়ায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া কেউ আর ঠেকাতে পারবে না। এমন একটা 'স্টোরি' সম্পূর্ণ তাঁর একার। এর চাইতে বড় 'স্কুপ' আর কী হতে পারে!

'চলুন এবার, অধ্যাপক বোস,' বলেন ভবতারণ, 'সবে তো কলির সন্ধ্যে। এখনও তো কিছুই দেখেননি। চলুন, দেখবেন আমার রাজত্বের বাকিটা।'

সকলে আবার জিপে উঠলেন। মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে। নিজেদের চোখকেও কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এও কি সম্ভব!

মিনিট পাঁচেক পরে জিপ দুটো এসে ঢুকলো একটা কাঁটা তারের উঁচু বেড়ায় ঘেরা এলাকার মধ্যে। সেখানে একটা অতি সুদৃশ্য একতলা বাংলোর মতো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল জিপ। বাড়িটার দরজার উপরে লেখা 'ডাইনোসর পার্ক ভিসিটরস্ সেন্টার।'

সকলে নামলেন জিপ থেকে। বাড়িটার সামনে একটা বড় গাড়ি রাখার জায়গা, পুরোটা পিচ বাঁধানো। উত্তর দিকে লম্বা একটা দোতলা বাড়ি, তাতে সারি সারি জানলা দেখা যাচ্ছে। ভিতরে যাওয়ার দরজা একটাই। সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পাহারায়। মনে হল বাড়িটা একটা হোটেল। দক্ষিণ দিকে যে একতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটাতে দরজা জানলা কিছুই

নেই। ভিজিটরস্ সেন্টারের চারপাশে খোলা জমিতে ফার্ন গাছ লাগানো রয়েছে।

সকলে দাঁড়িয়ে চার দিক দেখছেন। রাকেশ বললেন 'চার পাশটা দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছি। অবশ্য যুগটা জুরাসিক কি না তা বলতে পারবো না।'

রায়া মূলত ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্রী। দীর্ঘদিন প্যালিওবোটানি বা প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা নিয়েও কাজ করেছিলেন স্নাতকোত্তর স্তরে। ফার্নগুলোকে ভালো করে দেখে অজিতকে বললেন রায়া, 'দেখো, খাঁটি জুরাসিক ফার্ন এগুলো। "সেরেন্না ভেরিফরমানস" ল্যাটিন নাম। এর কুড়ি কোটি বছরের পুরনো প্রচুর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তো জানই। এখন কেবল ব্রাজিল আর কলম্বিয়ার জলাভূমি অঞ্চলে এই ফার্ন জন্মায়। রাকেশ, তোমার লেখার জন্যে একটা জমাটি তথ্য দিই। এই যে ফার্ন দেখছো না, এর রেণুর মধ্যে একটা মারাত্মক বিটা-কারবোলাইন এ্যালক্যালয়েড আছে। সুন্দর ওই লতানে ডাল ছুঁলেও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো। খানিকটা ওই পাতা চিবিয়ে খেলে বাচ্চারা মরেই যাবে।'

'সেই গাছ এখানে লাগিয়েছে?' রাকেশ বলেন, 'পাগল নাকি এরা?'

'তা জানি না, তবে অসতর্ক তো নিশ্চয়। মুশকিল কি জানো, লোকে গাছপালাকে হয় নিছক নিষ্প্রাণ পশ্চাৎপট ভাবে, না হয় দেখে নেহাত বাগান সাজানোর উপকরণ হিসেবে। ভাবে না যে গাছপালাও জীবিত। তারাও সপ্রাণ। অন্য প্রাণীদের মতো তারাও বাঁচার জন্যে লড়াই করছে সর্বদা। এই যে ফার্নের বিষ, এও তো এক ধরনের আত্মরক্ষার অস্ত্র। দেখে মনে হচ্ছে, এঁরা 'ডাইনোসর পার্ক' তৈরি করতে গিয়ে যতটা সাবধান হওয়া উচিত ছিল ততটা হননি, যতই চারদিকে বৈদ্যুতিক বেড়া লাগানো থাক না কেন।'

ততক্ষণে সকলে ভিজিটরস্ সেন্টারের বারান্দায় উঠে এসেছেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন ভবতারণ। কথাটা তাঁর কানে গেছে। বেশ বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিসেস বোস, আমাকে দেখে কি খুব বোকা মনে হচ্ছে আপনার? অসতর্ক বা বোকা লোক হলে আমার দুনিয়া জোড়া ব্যবসাপত্র চালাই

কী করে? ভাবছেন কী করে যে আমি যথেষ্ট সাবধান হইনি? ভয় পাবেন না, সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থাই এখানে আছে, যে-কোনো রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আয়োজন করে রেখেছি আমি এখানে।'

বাচনভঙ্গির এইরকম আকস্মিক পরিবর্তনে সকলেই একটু হকচকিয়ে গেলেন। এতক্ষণের অতি ভদ্র লোকটির আসল চেহারা কি তাহলে অন্য রকম? ভবতারণ নিজেও বুঝলেন কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কিছু মনে করবেন না, বুড়ো হয়েছি তো, কী না কী বলে ফেলি। আসলে আমার অতি সাধের এই পার্ককে কিছু বললে বড্ড গায়ে লাগে। আসুন, আসুন সকলে ভেতরে। অনেক কিছু দেখাবো। সময় তো আবার বেশি নেই।'

ঢুকলেন সকলে ঘরের ভিতর। কেমন যেন একটু সুর কেটে গেল। কিন্তু এবারে যে ছবি ধীরে ধীরে চোখের সামনে উন্মোচিত হতে শুরু করল তার বিস্ময়ের ছটায় সকলের মন থেকে এক মুহূর্তের এই খটকা খুব দ্রুত মুছে গেল।

দরজার পরেই বড় হল। তার পাশেই একটা প্রেক্ষাগৃহ। সেখানে বসলেন সকলে ভবতারণের সহাস্য নির্দেশে। ঘরের আলো নিভে গেল। সামনের পর্দায় ফুটে উঠল ভবতারণের ছবি। একটু হেসে ডান দিকে ঘাড় হেলাতেই তাঁরই শরীর থেকে আর একটি ভবতারণের মূর্তি বেরিয়ে দাঁড়াল তাঁর ডান পাশে। বাঁ দিকে ঘাড় হেলাতে ঠিক তেমনি আর একটি মূর্তি বেরিয়ে দাঁড়াল। 'ঠিক এইভাবে', বলতে শুরু করল ভবতারণের মূর্তি, 'ইচ্ছে করলেই আমরা একের পর এক অসংখ্য "ভবতারণ" তৈরি করতে পারি। যে পদ্ধতিতে এমন একটি কাজ সম্ভব তার নাম "ক্লোনিং"। জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং আজ এমন উন্নত হয়েছে যে আশ্চর্য এই কাজ আজকের দিনে অপেক্ষাকৃত সহজ। এই রকম পদ্ধতিতেই ডাইনোসর পার্কের বৈজ্ঞানিকরা তৈরি করেছেন এখানকার ডাইনোসরদের। কী করে করেছেন? দেখুন এবার।'

পর্দায় ছবি পালটে গেল। দেখা দিল একটা ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের কার্টুন ছবি। নড়েচড়ে সে বলতে শুরু করল: 'আমার নাম ডিএনএ। সব জীবনের মূলে আছি আমি। একটা জীবদেহকে

যদি বলা যায় একটা ইমারত, আমি তাহলে সেই ইমারতের ব্লুপ্রিন্ট। থরে থরে কোষ সাজিয়ে তৈরি হয় জীবদেহ। আমি থাকি সেই কোষের মধ্যে। একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যদি আমাকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে আমার প্রতিলিপি আঁকা হয়ে যাবে। এইবারে কোষ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হতে থাকবে আমার অসংখ্য হুবহু যমজ। কোনো প্রাণীর শরীর থেকে আমাকে বের করে নিয়ে আমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা নকশার পাঠোদ্ধার করে সেইমতো আমার প্রতিকৃতি বানিয়ে ফেলতে পারলেই সেই প্রাণীর একটা হুবহু নকল তৈরি করা যাবে, তা সে প্রাণী আজকেরই হোক, আর কুড়ি কোটি বছর আগেরই হোক। তবে তার আগে আমার চেহারাটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিতে হবে।

'আমার শরীরের পাঠোদ্ধার করা খুব ঝামেলা কিন্তু। একটা কমপিউটার দিনে চব্বিশ ঘন্টা একনাগাড়ে খুব দ্রুত যদি আমার সব জটিলতা পড়ে দেখতে থাকে তাহলে কাজ সারতে তার সময় লাগবে দু'বছর।

'বুঝুন কান্ড। আমার মধ্যে আছে তিনশো কোটি ধাপ। সেগুলোকে সাজাতে হবে ঠিক ক্রম অনুযায়ী। বারে বারে একই কাজ করে যেতে হবে হুবহু একই ভাবে, নইলে সব নষ্ট। এমনিতে এতে লাগার কথা অনন্ত সময়। কিন্তু এটা তো সুপার কমপিউটার আর অটোমেটেড জীন সিকোয়েন্সারের যুগ। তাই খুব তাড়াতাড়ি এই কঠিন কাজটাও সেরে ফেলা যায়।'

এবারে পর্দায় দেখা গেল চলে ফিরে বেড়াচ্ছে ব্র্যাকিওসরাস। তাকে দেখিয়ে ডাবল হেলিক্স বলে চলে, 'এই দেখুন এই দৈত্যকে। ওকে তো এখানেই বানানো হয়েছে। কী করে হলো দেখবেন? দেখুন তাহলে।'

বলতে থাকে ডাবল হেলিক্স। আর পর্দায় কার্টুন ছবিতে দেখা যায় তার কথার চলমান রূপ। 'একদিন এক ডাইনোসরকে কামড়ে দিয়েছিল এক মশা। তারপরে উড়ে গিয়ে মশা বাবাজী বসেছিলেন এক গাছের গায়ে। সেখানে গাছের আঠালো রসে চাপা পড়ে তিনি গেলেন মরে। কিন্তু মজার কথা হলো, রসের মধ্যে আটকা

ছিল বলে হাওয়াবাতাস না লাগায় তার শরীরটা একটুও নষ্ট হলো না। একদম অবিকৃত রইল। তার সঙ্গে সঙ্গে অবিকৃত রইল তার পেটের মধ্যে ব্র্যাকিওসরাসের রক্ত। তারপরে সেই জমাট বাঁধা রস মাটির তলায় চাপা পড়ে থেকে থেকে বহু বহু কোটি বছর পরে হয়ে গেল অ্যাম্বার। সেই অ্যাম্বার বার করা হলো খনি থেকে। দেখা গেল মশার দেহ তার মধ্যে থেকে গেছে যেমনটি ছিল সেই জুরাসিক যুগে ঠিক তেমনই। বৈজ্ঞানিকেরা এবার বিশেষ এক ধরনের সিরিঞ্জ দিয়ে মশার পেট থেকে ডাইনোসরের রক্ত বার করে নিলেন। সেই রক্তকণিকা থেকে পেলেন ডাইনোসরের ডিএনএ। ব্যাস, এইবার শুরু হলো ডাইনোসর তৈরির কাজ।

'কিন্তু ঝামেলা হলো অন্য রকম। এত কোটি বছর পরে ডিএনএ জ্যান্ত আছে বটে, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ আর অবিকৃত নেই। দেখা গেল পেঁচিয়ে ওঠা দুই তন্ত্রীর একটার একাংশ হারিয়ে গেছে ছিঁড়ে। কী করা যায়? ধরা হল একটা ব্যাঙ। তার ডিএনএ-র অংশ নিয়ে মেরামত করা হলো ডাইনোসর ডিএনএ-কে। এইবার তাকে পুরে দেওয়া হলো কুমিরের ডিম্বাণুর মধ্যে। তারপর প্লাস্টিকের ডিমের খোলার মধ্যে পাখির ডিমের কুসুমটুসুম বানিয়ে তার মধ্যে সেই ডিম্বাণুকে ডুবিয়ে বাড়তে দেওয়া হলো। সেই ডিমে তা দিতে শুরু করা হলো কৃত্রিম উপায়ে। সময় হলে ডিম ফুটে বেরিয়ে এল বাচ্চা ডাইনোসর। তারপর তারা বড় হলো, সেয়ানা হলো, মাঠে ময়দানে চরে খেতে শিখল, শিখল আপনাদের আনন্দ দিতে। চলুন এবার, পার্কে ঢুকে দেখুন তো কী করছে ওরা।'

পর্দায় ছবি দেখান শেষ হলো। ঘরের আলো জ্বলে উঠতেই এগিয়ে এলেন সামনে ভবতারণ। আলোর সামনে হাতের ছড়িটা তুলে ধরলেন, বললেন, 'এই দেখুন, অ্যাম্বার।'

সকলে দেখল, ছড়ির মাথায় পল কাটা হলদেটে স্ফটিকখণ্ড। তার ভিতরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা মশাকে।

'এই একটা মশা থেকেই এত ডাইনোসর তৈরি হয়েছে?'

'না, না। আমরা একশো সত্তর লক্ষ ডলার মূল্যের অ্যাম্বার কিনেছি পৃথিবীর বিভিন্ন অ্যাম্বারের খনি থেকে। তার মধ্যে থেকে প্রচুর এরকম কীট পতঙ্গ পেয়েছি। তাদের পেট থেকে খুঁজে

খুঁজে বার করেছি বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসরের ডিএনএ। আর সেই অ্যাম্বার নিয়েই তো গোল বাধলো, আমার ডাইনোসর পার্ক পুরোপুরি তৈরি হওয়ার আগেই দেখাতে হলো আপনাদের।'

'কেন?' রাকেশের সাংবাদিক-ইন্দ্রিয় সজাগ হয়, 'কী হয়েছে?'

'আরে মশাই, যত ফালতু লোকের সন্দেহবাতিক আর কি! সরকারি লাল ফিতের যাচ্ছেতাই জট। কী বলবো বলুন। এত বড় একটা কাজ করছি আমি, আর সবাই মিলে লেগে পড়েছে বাগড়া দিতে। বলছি খুলে আপনাদের সব কিছু।

'কাজটা তো বিশাল। টাকাও লাগে প্রচুর। সেই টাকার বেশিটাই আমি দিলাম। বাকিটা জোগাড় হলো একটা কোম্পানি তৈরি করে শেয়ার বেচে। বেশি শেয়ার কিনল জাপানিরা। কোম্পানির নাম দেওয়া হলো "গ্লোবাল জেনেটিকস্"। তারপর শুরু হলো দক্ষ লোক সংগ্রহ করা আর দরকারি যন্ত্রপাতি কেনা, কাঁচামাল কেনা। ডাইনোসর তৈরির সঙ্গে অন্য সব জিনিস তৈরির খুব তফাৎ নেই, এ কাজটা একটু বেশি জটিল, এই যা।

'তা লোকজন যাদের পেলাম তাদের কারো কারো সাথে একটু পরেই আলাপ হবে। জিনিসপত্রের কথা বলি। অনেক কিছু টুকিটাকি ছাড়াও কিনতে হলো তিনটে সুপার কমপিউটার, চব্বিশটা অটোমেটেড জিন সিকোয়েন্সার আর প্রচুর প্রচুর পরিমানে অ্যাম্বার। সারা দুনিয়ায় এত অ্যাম্বার কারো কাছে নেই আর।

'এত সব জিনিস কেনা দেখে হিংসে হলো অনেকের। অ্যামেরিকাতে মামলা ঠুকলো সরকার। বিদেশে এভাবে প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে যাওয়া চলবে না। সুবিধে হলো না অবশ্য কারণ "গ্লোবাল জেনেটিকস্" মূলত অ্যামেরিকার কোম্পানি। সে তার নিজের কাজে কম্পিউটার নিয়ে অন্যত্র ব্যবহার করলে আমেরিকার আইন তা ঠেকাতে পারে না।

'এইবার হিংসুটের দল শুরু করল অন্য কায়দা। ভারত সরকার তো ধার করে করে মাথার চুলও বিকিয়ে বসে আছে। একটু মোচড় মারলেই অ্যামেরিকার কথা শুনতে বাধ্য। আমার এখানে এই দ্বীপে কী হচ্ছে তা দেখার জন্যে নাকি পর্যবেক্ষকের দল আসবে। সকলের প্রশ্ন হচ্ছে, এত অ্যাম্বার দিয়ে আমি কী করি।

কোনো মানে হয়, বলুন তো? আমি এখানে বৈজ্ঞানিক জগতে এত বড় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছি, তৈরি করছি নতুন ধরনের চিড়িয়াখানা, যা দেখতে ছুটে আসবে দুনিয়ার যত ছোট বাচ্চার দল, ডিজনিল্যাণ্ড আর ম্যাজিক মাউন্টেন আর ডিজনিওয়ার্ল্ড উঠে যাবে এবার, সেটা তো কেউ ভাববে না, বলবে, দেখো, কী সব কতগুলো বিপদজনক জানোয়ার বানিয়েছে! আমি যে এত বড় একটা কাজ করেছি, অসাধ্য সাধন করেছি, নতুন করে প্রাণের সৃষ্টি করেছি, তা তো কেউ বলবে না।'

অজিত বহুক্ষণ কোনো কথা বলেননি। সব দেখছিলেন আর শুনছিলেন। তাঁর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছিল। ভাবছিলেন, আমার গবেষণার গোটা জগতটাই এবার পালটে যাবে। কী অসামান্য সুযোগ আসছে! আমার ধারণাগুলো আর আন্দাজগুলো সঠিক কিনা তা বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবো। ভবতারণের দীর্ঘ বক্তৃতায় আর প্রায় নগ্ন আত্মপ্রচারে একটু আশ্চর্য হয়ে এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভবতারণবাবু, আপনি জেনেটিকস্ নিয়ে কতদিন ধরে গবেষণা চালিয়েছেন?'

'আমি?' একটু হোঁচট খান ভবতারণ, 'আমি ঠিক বৈজ্ঞানিক নই। আমি সংগঠক, উপযুক্ত লোকজন একত্র করে কাজ করিয়ে নেওয়াই আমার দায়িত্ব। গোটা ব্যাপারটাই তো আমার মাথা থেকে এসেছে। বৈজ্ঞানিকরা তত্ত্ব বোঝে, প্রযুক্তিও খানিকটা বোঝে, কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগ বোঝে না। আমি সেটা বুঝি। তাই কল্পনাশক্তি আর নতুন কিছু করার সাহস নিয়ে এগিয়ে এসে এই ডাইনোসর পার্ক তৈরি করে ফেলেছি আমি।'

এরকম একটা ভাষণে সকলেই একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ভাবতারণ অন্য দিকে চোখ ফেরাতেই রাকেশ ইঙ্গিতে রায়াকে বললেন, 'মাথার স্ক্রু ঢিলে মনে হচ্ছে।'

ইতিমধ্যে দু'জন উর্দি পরিহিত লোক এসে চা দিয়ে গেছে সকলকে। কথা চলছিল চা খেতে খেতে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে হাসিতে ভরে গেল ভবতারণের মুখ। অতিথিদের বললেন, 'আপনাদের একটা দারুণ জিনিস দেখাবো এবার। আপনাদের এখানে ডেকেছি, আমার ডাইনোসর পার্ক সম্বন্ধে দুনিয়ার মানুষকে যাতে অবহিত

করতে পারেন আপনারা। অধ্যাপক বোসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, মিসেস বোসের তোলা ছবি আর মিঃ পান্ডের লেখা, তিনটি মিলে ভারত তথা পৃথিবীতে সকলকে জানাবে আমার পার্কের কথা। চার্লি ওর দোস্তদের বলে এই পার্ক চালাবার টাকা জোগাড় করে দেবে আমাকে। যতই ধনী হই না কেন, চিরদিন এই পার্ক চালাতে হলে আমাকেও ফতুর হতে হবে। তাছাড়া, ব্যবসার মূল কথাই হলো অন্যের টাকা খরচ করে নিজে মুনাফা লোটা। এক্ষুণি যা আপনাদের দেখাবো, তাতে আপনারা সকলেই বুঝবেন আমার ডাইনোসর পার্ক কী অসাধারণ একটা সৃষ্টি। আমি এখানে একটু কাজ সারছি, আমার লোক আপনাদের নিয়ে যাবে বাইরে। দেখা হয়ে গেলে ফিরে এখানে আসুন।'

প্রায় অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে ঝকঝকে রোদ্দুরে চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের। এটা ভিজিটরস্ সেন্টারের দক্ষিণ দিক। একটা ছোট জমি। তার পরেই একটা কাঁটা তারের তিরিশ ফুট উঁচু বেড়ায় ঘেরা জায়গা। সেখানে ঘন বন। পাইন আর ট্রি ফার্ন আর আরও নানা বিচিত্র গাছের ভীড় সেখানে। বেড়াটা যথারীতি বিদ্যুৎ সঞ্চারিত। উপরে লাল আলো জ্বলছে বিপদসঙ্কেত হিসাবে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন রক্ষী এবং আরেকজন দীর্ঘকায়, সুগঠিত দেহ, তামাটে মুখ সুপুরুষ ব্যক্তি। চেহারায় ব্যক্তিত্ব, শারীরিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট।

কাছে আসতে ওঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম অ্যালান ওয়েবস্টার। বিখ্যাত শিকারী। আফ্রিকায় কেটেছে ওঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়। পশুপক্ষীর, বিশেষ করে হিংস্র মাংসাশী বিভিন্ন বৃহৎ পশু এবং হাতির জীবনযাত্রা ও মানসিকতা সংক্রান্ত ব্যাপারে ওঁর অভিজ্ঞতার জুড়ি মেলা ভার। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে চিড়িয়াখানা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ওঁর মতামত চাইতে আসে সকলে। ভবতারণ অনেক বলেকয়ে ওঁকে এখানে এনে ডাইনোসর পার্কের নিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছেন। এখানে এসে পৃথিবীর হিংস্রতম সরীসৃপদের মোকাবিলা করার সুযোগ পেয়ে অ্যালান খুব খুশি।

সকলে দাঁড়ালেন বেড়ার পাশে। অ্যালান বেড়ার খুব কাছে

যেতে বারণ করলেন। বললেন, 'চুপ করে দাঁড়ান সবাই।'

বেশ কয়েক সেকেণ্ড কাটলো। বাতাসে কতগুলো মাছির ভনভনানি শোনা যাচ্ছে। সব নীরব। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ রায়া অজিতের কাঁধে টোকা মেরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বেড়ার ওপাশের ঝোপঝাড়ের দিকে। ফার্নগুলোর মধ্যে অজিত দেখলেন একটা কোনো প্রাণীর মাথা দেখা যাচ্ছে। একদম নড়ছে না সেই প্রাণী। কেবল দুটো বির'ট চোখ তাঁদের দেখছে।

মাথাটা দু'ফুট লম্বা। ছুঁচলো মুখ, কানে'ন ফুটো পর্যন্ত বিস্তারিত দাঁতের সারি। মাথাটা কুমির বা তেমন কোন বড় গিরগিটি জাতীয় জীবের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। চোখে পলক পড়ছে না। একটুও নড়ছে না প্রাণীটা। গায়ের চমড়া খসখসে, কুমিরের মতই ঢিপি ঢিপি। রঙ হলদে-বাদামী। তার মধ্যে কালচে লাল দাগ। বাঘের গায়ের ডোরার মতো।

অজিত দেখলেন, পেশীবহুল সামনের পা তুলে প্রাণীটা একটা ফার্নের ডাল সরিয়ে ধরল। তিনটে করে আঙুল, প্রত্যেকটার শেষে লম্বা নখ। ধীরে ধীরে ফার্নের ডাল সরাতে থাকে প্রাণীটা।

অজিত একটু কেঁপে উঠলেন। আমাদের শিকার করতে এগোচ্ছে ও, মনে হল তাঁর।

মানুষ তো স্তন্যপায়ী জীব। সরীসৃপদের প্রতি তার কোনো আত্মীয়তা বোধ থাকে না। ঘেন্নাটা জন্মায় স্বাভাবিক কারণেই। শরীরের অনড় নিস্পন্দ ভাব, হিম শীতল চাউনি, দেহের গতি—সবই অন্যরকম। ওরা অন্য এক দুনিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়, যে দুনিয়া পৃথিবী থেকে মুছে গেছে বহু আগে। ওরা স্তন্যপায়ীদের জাতিশত্রু। এমনভাবে তাকিয়ে আছে এই প্রাণীটা যে—

আক্রমণ এল একেবারে আকস্মিকভাবে। ডান, বাঁ, দু'দিক থেকেই। দুটো দানব অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে দশ গজ দূরত্ব অতিক্রম করল। অজিত ঝাপসা দেখলেন, দুটো বারো ফুট লম্বা শরীর, শক্ত লম্বা লেজ, বাঁকা নখ, ধারালো দাঁতে ভরা মুখব্যাদান করে ছুটে আসছে সগর্জনে।

গোটা শরীর বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে, পিছনের পায়ের ধারালো নখ ছড়িয়ে, ঝাঁপ দিল দুটো সাক্ষাৎ যম। বেড়ার উপর পড়েই

ছিটকে গেল তারা। ওজোনের গন্ধে বাতাস ভরিয়ে বেড়ার তারে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের ফুলকি।

প্রাণী দুটো উল্টে পড়ে গেল মাটিতে। হিস হিস আওয়াজ করতে লাগল। সকলে এগিয়ে গেলেন বেড়ার দিকে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

এইবারে ঝাঁপ দিল তৃতীয় প্রাণীটা। একই ভঙ্গিতে সেও আছড়ে পড়ল বেড়ার উপরে। আবার চারদিকে ছিটকে গেল আগুনের ফুলকি। এবারে তিনটে প্রাণীই উঠে দাঁড়াল এক সঙ্গে। গজরাতে গজরাতে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল একত্রে। পিছনে পড়ে রইল কেবল খানিকটা পচা মাংসের গন্ধ এবং হালকা একটু ধোঁয়ার রেশ।

হতবাক, সন্ত্রস্ত, সকলে তাকিয়ে রইলেন বনের দিকে। অজিত ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'ভেলোসির্যাপটর।'

'এত দ্রুতগতি?' রায়ার মুখে কথা সরছে না।

'হ্যাঁ,' অজিত এবার সম্বিত ফিরে পান, 'এরা দল বেঁধে শিকার করে। অতর্কিত গোপন আক্রমণ এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই প্রায় যে কোন আকৃতির শিকারই এরা ধরতে পারে অতি সহজে। যেমন ধর, একটা বড় হ্যাড্রোসর, তাকে ধরাশায়ী করতে এদের সময় লাগবে জোর পাঁচ মিনিট। একটা পিঠে লাফিয়ে উঠে পেছন থেকে কামড়ে ধরবে তার লম্বা গলা। দুটো চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাগুলো কামড়ে কামড়ে অকেজো করে দেবে। আর একটা কি দুটো মিলে ধারালো ওই তলোয়ারের মতো নখ দিয়ে ফালাফালা করে দেবে পেট। ব্যস্, শিকার শেষ।'

শিউরে উঠলেন রায়া। মাত্র দুটো বেড়া ছিল মাঝখানে, যদি লাফিয়ে টপকে আসতো! এবার রাকেশ প্রশ্ন করেন, 'এই যে একত্রে আক্রমণ, এর জন্যে বুদ্ধি তো লাগেই, কিন্তু ভাষা ছাড়া এরকম তাল মিলিয়ে কাজ সম্ভব হয় কী করে?'

'দলবদ্ধ হয়ে শিকার করতে ভাষা খুব যে লাগে তা নয়। শিম্পাঞ্জিরা তো এই ভাবেই শিকার ধরে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে বাঁদর মেরে খায় ওরা। পারস্পরিক বোঝাপড়া হয় কেবল দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে।'

'গতি তাহলে এদের প্রধান অস্ত্র?'

'হ্যাঁ। যে কোন আধুনিক সরীসৃপের চেয়ে এরা দ্রুতগতি। মদ্দা কুমির খুব জোরে ছুটতে পারে, কিন্তু বেশি দূর পারে না, বড় জোর পাঁচ ছ'ফুট। ইন্দোনেশিয়ার পাঁচ ফুট লম্বা কোমোডো ড্রাগনরা ঘন্টায় তিরিশ মাইল বেগে ছোটে। একটা মানুষকে ধরার জন্যে যথেষ্ট গতি। কিন্তু এরা দেখছি অন্তত দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করতে পারে।'

'চিতার মতো। ঘন্টায় ষাট সত্তর মাইল।'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু ওরা ঠিক যেন পাখির মতো দমকে দমকে এগোচ্ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। অনেকটা সেই রকম। বর্তমান জগতে কিছু স্তন্যপায়ী আছে যাদের ক্ষিপ্রতা এই রকম। যেমন বেজি। শঙ্খচূড়ের ছোবল দিব্যি এড়িয়ে গিয়ে গলা কামড়ে ধরে। পাখিরা তো পারেই। যেমন আফ্রিকার কেরাণী পাখি, সাপ ধরে খায়। আর আছে নিউ গিনির কসোয়ারি। ঠিক এই রকম দ্রুত আর হিংস্র।'

'তাহলে কী বলবো? ভেলোসির‍্যাপটরগুলো দেখতে সরীসৃপের মতো, কিন্তু চলে ফেরে পাখির মতো? বুদ্ধি আর ক্ষিপ্রতাতেও শিক্‌ড়ে পাখির মতো?'

'তা বলা যায়। জীবাশ্মবিদরা মোটামুটি এমনই আন্দাজ করে এসেছেন এতকাল।'

'এদের বুদ্ধি তাহলে বেশ উন্নত বলুন!'

'তাও ঠিক।'

এতক্ষণে মুখ খোলেন চার্লস। 'মনে তো হলো না বুদ্ধি খুব আছে। দেখছে বেড়া ছুঁলে শক লাগে, তবু লাফাচ্ছে।'

রক্ষীটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চার্লসের মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'বুদ্ধি কেমন পরীক্ষা করার চেষ্টা করবেন না। আপনার আর ওদের মাঝখানে বেড়াটা আছে, আপনাদের কপাল ভালো।'

হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দে মুখ ফেরালো সবাই। একটা ক্রেন আসছে। দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা গরু ঝুলছে তা থেকে। ক্রেনটা ঘুরে বেড়া টপকে গরুটাকে নামিয়ে দিল বনের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে

রক্ত হিম করা কতগুলো গর্জন শোনা গেল। বনের মধ্যে চলল ঝটাপটি। সকলে চুপ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। রায়ার হাতের ক্যামেরা হাতেই রয়ে গেছে সেই থেকে। এবার সেটা চোখে তুললেন তিনি।

বনের ডালপালা সরিয়ে ধরল আবার একটা হাত। বেরিয়ে এল সেই ভয়ঙ্কর মুখ। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সকলের দিকে।

বিভৎস চোয়াল বেয়ে এখন রক্তের ধারা নামছে। দাঁতের ফাঁকে আটকে আছে মাংসের টুকরো। ক্রুরতাভরা চোখে আদিম হিংস্র চাউনি আর অসীম ক্ষুধা।
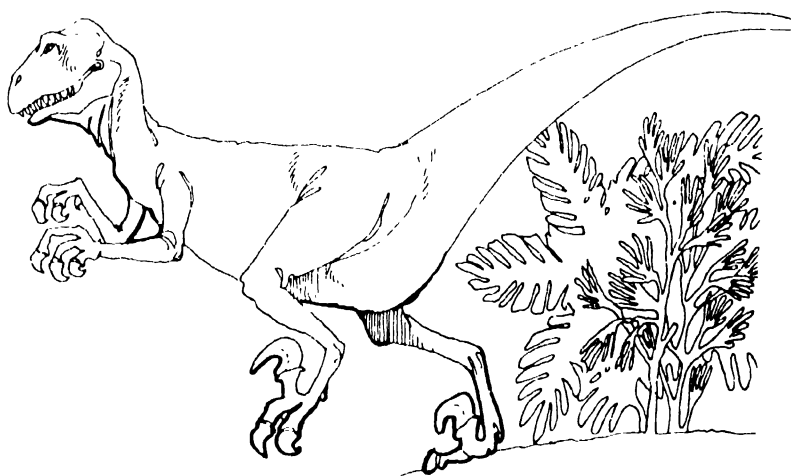
ভেলোসির‍্যাপটরের ডিম

ভিজিটরস্ সেন্টারের প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার পথেই প্রধান হল। তার মাঝখানে রয়েছে দুটো বিশালকায় কঙ্কাল। একটা ব্র্যাকিওসরাস, আর অন্যটা টিরানোসরাস। এছাড়াও সমস্ত ঘরটা ভরে আছে বহুবিধ নকশা, ছবি, পোস্টার আর ছোটখাট কঙ্কালে। বিরাট বড় একটা যাদুঘর যেন। এখনও যে ডাইনোসর পার্ক নির্মাণকার্য শেষ হয়নি তা বোঝা যাচ্ছে এদিকে ওদিকে মই, ভারা, এ সমস্ত ছড়িয়ে থাকতে দেখে।

ঘরের পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে এগিয়ে কয়েকটা ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নামলে পৌঁছনো যায় একটা রেস্তরাঁয়। মাঝখানে একটা বড় টেবিল ছাড়াও সেখানে দুজন এবং চার জন বসার উপযোগী আরও বেশ কিছু টেবিল রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। গোল ঘরটার চারদিকে কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের মাঠ আর বন দেখা যায়। কিছু জায়গায় বড় বড় কাঁচের গায়ে নানা রকম ডাইনোসরের রঙিন ছবি আঁকা আছে। জানলাগুলোর মাঝে মাঝে রয়েছে কতগুলো টেলিভিশনের পর্দা। সেগুলোতে নানা রকম ছবি ফুটে ওঠে। কোনোটিতে দেখা যায় বিভিন্ন ডাইনোসরের জীবনচক্র, কোনোটি দেখা যায় ডাইনোসর পার্কের নানা পর্বের চলমান ইতিহাস,

কোনোটাতে আবার দেখা যায় পার্কের বিভিন্ন এলাকার চিত্র। একদিকে রয়েছে রান্নাঘরে যাওয়ার দরজা। আর একদিকে একটা দরজা দিয়ে নেমে গেলে ঢোকা যায় ভূগর্ভস্থ কনট্রোল রুমে। সেখান থেকে একটা ঢাকা বারান্দা দিয়ে আবার উঠে আসা যায় ইনকিউবেশন রুম আর নার্সারিতে।

সাধারণ দর্শকরা, ভবতারণ বললেন, আসবে কেবল মাত্র ওই কাফেটারিয়া পর্যন্ত। অন্য এলাকাগুলোর ছবি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাদের। ভিজিটরস্ সেন্টারের সামনে থেকেই ছাড়বে পার্কের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার স্বয়ংক্রিয় গাড়িগুলো। ফিরে এসে থামবে ওখানেই। অতিথিরা খাওয়াদাওয়া সেরে ভিজিটরস্ সেন্টারের উত্তর দিকের হোটেলে থাকতে পারবে। এমনিতেই হোটেলটা নিরাপদ, কিন্তু দুর্বলচিত্তদের সাহস জোগাতে সব ক'টা জানলায় বসানো আছে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত লোহার গরাদ এবং দরজাগুলো সব বিশেষভাবে তৈরি ইস্পাতের। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় দরজাগুলো বন্ধ হয়ে থাকবে। অবশ্য সাধারণ তালার ব্যবস্থাও আছে। দরজা খোলা-বন্ধের এই ব্যবস্থা অবশ্য শুধু হোটেলে নয়, আমাদের এই বাড়িগুলোর প্রত্যেকটিতেই আছে।

কনট্রোল রুমে যাওয়ার পথে এসব কথা হচ্ছিল। ভেলোসির্যাপটরের ভয়াল চেহারা সকলেরই বুকের মধ্যে তখনও কাঁপুনি তুলছিল। রাকেশ বললেন, 'মিঃ চক্রবর্তি, এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন? যথেষ্ট সাবধানে সব রাখা হয় তো? ধরুন যদি, একটা ওই রাক্ষস হঠাৎ ছাড়া পেয়ে যায়?'

'চিন্তা করবেন না, পান্ডে সাহেব,' মুচকি হেসে ভবতারণ বলেন, 'ছাড়া পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ওই তারের বেড়া দেখলেন, ওটার এপারে ওরা আসতে পারবে না। চেষ্টা কি কম করে ওরা! কক্ষনো ওরা বেড়ার একই জায়গায় দু'বার আক্রমণ করে না, কিন্তু বিভিন্ন অংশে প্রায়ই গুঁতো মারে। ঠিক যেন পরীক্ষা করে করে দেখছে, কোন দুর্বল জায়গা আছে কিনা। শয়তানগুলো কম ধূর্ত নাকি? তবে দুর্বল কোন জায়গাই নেই। আর তাও যদি ধরে নি কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো, ওরা বেরিয়ে এলো, তাহলেও চিন্তা নেই। অ্যালান আছে, ওর ক'জন চেলা

আছে। প্রত্যেকের কাছে অতি শক্তিশালী রাইফেল থাকে যার এক একটা গুলি এক একটা ছোট ক্ষেপণাস্ত্রের মতো মারাত্মক। আমাদের ঘুমপাড়ানী বন্দুকগুলোও খুব কাজের। ঠিক জায়গায় একটা গুলি লাগলেই টিরানোসরাসকেও ঘুমিয়ে পড়তে হবে। অ্যালান অবশ্য মাঝে মাঝে একটু ঘাবড়ে যায়, বলে বাজুকা এনে দিতে, বলে টি-ও-ডবলিউ ক্ষেপণাস্ত্র এনে দিতে। খামোখা এসব এনে কী হবে? আমার এখানকার ব্যবস্থা দেখ শুনো করে সুপার কমপিউটার আর স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা প্রোগ্রামিং করেছে এবিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিশেষজ্ঞ সুবোধ প্রামাণিক। লোকটা একটা শুয়োরের মতো নোংরা, কিন্তু কাজে একেবারে বিশ্বকর্মা।'

'ব্যবস্থাটা কী রকম?' অজিতের গলায় অসহিষ্ণুতা। 'চলুন, কনট্রোল রুমে দেখবেন সব।'

যে ঘরটায় এবার তাঁরা ঢুকলেন সেটাকে কেপ কেনেডির পরিচালনা কেন্দ্র বলে মনে করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ঘরের মাঝখানে থামের মতো তিনটে সুপার কমপিউটারের উপস্থিতি। সারা ঘরে অজস্র টেলিভিসন পর্দা এবং কনসোল। চারদিকে ছড়িয়ে আছে কমপিউটার টারমিনাল। প্রায় সব ক'টা পর্দা সজীব। দু'জন মাত্র লোক রয়েছে ঘরটাতে।

'অবাক হবেন না।' ভবতারণ বললেন, 'আমার ডাইনোসর পার্ক চালাতে বস্তুত অল্প ক'জনের বেশি লোক লাগে না। এখানে প্রায় সব কিছু স্বয়ংক্রিয়। এখানে বসেই আমরা সব কিছু দেখতে শুনতে পাই। বুঝিয়ে দিচ্ছি সব ব্যবস্থা আসুন।'

'প্রথমত, এখানে আসার সময়ই দেখেছেন', গলা খাঁখারি দিয়ে ভবতারণ বেশ মাস্টারির ভঙ্গিতে বলতে শুরু করেন, 'এই দ্বীপটাকে প্রকৃতিই ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে। মনে হয় এই দ্বীপটা কোনো এক অতীতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ছিল। কালক্রমে দ্বীপে পরিণত হলেও এর ভেতরের দিকটায় জমি এখনও উঁচু নিচু। কিছু জায়গা মোটামুটি সমতল, কিছু জায়গা জলা। একটা উঁচু শৈলশিরা দ্বীপটার মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর ঘুরে ফিরে এসেছে। সেটার সুযোগ নিয়েছি আমরা। শিরাটা বরাবর রাস্তা বানিয়ে নাম দিয়েছি রিজ রোড। দর্শনার্থীদের গাড়ি চলবে এই

রাস্তায়, তার ভেতর থেকে ডানদিকে বাঁদিকে তাকালেই দেখা যাবে আমার ডাইনোরসদের।

'প্রাকৃতিক সুরক্ষাব্যবস্থার পরেই শুরু হচ্ছে আমার ব্যবস্থা। পুরো ডাইনোসর পার্ক ঘিরে আছে দশ হাজার ভোল্ট তরিৎসঞ্চারিত তারের বেড়া যা আবার বসানো আছে কংক্রিটের দেয়ালের উপর। পরবর্তী সুরক্ষাচক্র রয়েছে আমাদের এই ভিজিটরস্ সেন্টার, কনট্রোল রুম, ইনকিউবেশন সেন্টার, নার্সারি, হোটেল, ভেলোসির্যাপটর চত্বর, গ্যারেজ প্রভৃতি ঘিরে। হোটেলের প্রত্যেক দরজা প্রত্যেক জানলা লোহার গরাদ দিয়ে আটকানো। পার্কের বাকি অংশ আবার একটা একই রকম বৈদ্যুতিক বেড়া দিয়ে ঘেরা। তাতে একটি মাত্র দরজা, সেটার খোলাবন্ধ কমপিউটার দ্বারা পরিচালিত। হাতে খোলার ব্যবস্থা একটা আছে, কিন্তু সেটা খুলতে তো মানুষ ছাড়া কেউ পারবে না। এই শেষ যে বেড়ার কথা বললাম তার মধ্যে ছাড়া আছে আমার তৃণভোজী ডাইনোসররা। এখনও পর্যন্ত বেশি প্রজাতি তৈরি করে উঠতে পারিনি। আপনাদের তার আগেই এখানে নেমন্তন্ন করতে হল।

'তৃণভোজীদের ছেড়ে রেখেছি খোলা জায়গায়। কিন্তু টিরানোসরাসের মতো মারাত্মক ডাইনোসরদের রেখেছি ওই বেড়ার মধ্যেও আলাদা বেষ্টনীতে, একটু খাদের মধ্যে। যাতে ওরা লাফিয়ে বেরিয়ে না আসতে পারে। আরও ডাইনোসর আছে যাদের একেবারে খোলা জায়গায় রাখা যায়নি। দেখতে পাবেন একটু পরেই এরা কারা।

'এক ধরনের মাংসাশী ডাইনোসরকে অবশ্য ছেড়ে রেখেছি অন্য কারণে। এত বড় একটা পার্ক, এতগুলো প্রাণী, তার মধ্যে একটা দুটো নানা কারণে মারা যেতে পারে। এত বড় বড় দেহ, ফেলবো কোথায়? তাই গোটা তিরিশেক কমপসগনেথাস তৈরি করে ছেড়ে রেখেছি। এরা ফুট খানেক লম্বা, বড় আকারের গিরগিটির মতো। তফাত হলো এরা দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে আর মৃতদেহ খায়। অবশ্য জীবিত কোন প্রাণী যদি না নড়ে পড়ে থাকে তাহলে তাদেরও এরা আক্রমণ করে। চলমান জীবিত প্রাণী থেকে এরা দূরেই থাকে। অনেকটা হায়নার মতো আর কি। এদের রেখেছি

জঞ্জাল সাফ করার জন্যে। এখানে আরেকটা আবর্জনা আমাদের খুব ঝামেলায় ফেলে। সেটা হলো ডাইনোসরদের মল। বুঝতেই পারছেন একটা ব্র্যাকিওসরাস কতটা মলত্যাগ করতে পারে। এই কমপসগনেথাসরা সেই মলও খেয়ে সাবাড় করে দেয়। প্রকৃতিদত্ত এমন ধাঙ্গড় পেয়ে খুব সুবিধে হয়েছে আমাদের।'

'এ তো শুধু বেড়ার কথা বললে,' চার্লস বলেন। 'বেড়া যদি কোথাও ভেঙে যায়? একটা ব্র্যাকিওসরাস যদি তার উপরে পড়ে যায়, শক খাবে ঠিকই, কিন্তু বেড়াটাও তো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যাবে!'

'তা যাবে। তবে সুরক্ষার অন্য ব্যবস্থাও আছে। এই যে, ন্যাট, এদিকে এসো, এঁরা কী বলছেন শোনো।'

সকলে আগেই লক্ষ করেছিলেন, কমপিউটার পর্দাগুলোর সামনে বসেছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক। মাথায় টাক, চোখে চশমা। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে। এবারে উঠে এলেন তিনি। 'নমস্কার,' পরিষ্কার বাংলায় বলেন ভদ্রলোক, 'আমার নাম ন্যাট উইভার। এখানকার সমস্ত কমপিউটারের দেখাশুনো পরিচালনার ভার আমার।'

'প্রোগ্রামিং কি আপনারই করা?' শুধোন রাকেশ।

'কিছু কিছু, তবে সব নয়। রক্ষণবিভাগের সমস্ত প্রোগ্রামিং করেছে সুবোধ প্রামাণিক।'

একটু দূরে বসে থাকা বিশাল বপু লোকটি ঠোঁট থেকে বিয়ারের টিনটা নামিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে একবার দাঁত বার করে হাসল। লোকটাকে দেখেই রায়ার কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে উঠল। মানুষ, না চর্বির তাল!

রাকেশই আবার প্রশ্ন করেন, 'মিঃ উইভার, মিঃ মারিনেত্তি জানতে চাইছিলেন কোথাও যদি বেড়া ভেঙে পড়ে তাহলে কী হবে?'

'এক তো সঙ্গে সঙ্গে বিপদসঙ্কেত বেজে উঠবে আর কমপিউটার তক্ষুনি বলে দেবে কোথায় ক্ষতিটা হলো। আমাদের লোক সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে মেরামতির কাজ শুরু করে দেবে। তার অনেক আগে হেলিকপটার নিয়ে ওখানে পৌঁছে যাবেন অ্যালান। সঙ্গে থাকবে ঘুমপাড়ানী বন্দুক আর অনেকগুলো "স্টান রড"।

সেগুলো দিয়ে বানিয়ে ফেলবেন অস্থায়ী বেড়া।'

'স্টান রড'? সে আবার কি?' রায়া প্রশ্ন করেন।

'কতগুলো লম্বা লম্বা লাঠি, তার মাথায় একটা করে ধাতব গোলক। সেগুলোর সংস্পর্শে এলেই শক লাগবে প্রচণ্ড।'

'কিন্তু ধরুন যদি টিরানোসরাস বেরোতে চাইছে এবং ওই শকে সে ভড়কাচ্ছে না তাহলে?'

'তাহলে আছে ঘুমপাড়ানী বন্দুক। তাতেও না হলে আছে বিস্ফোরক গুলি ছোঁড়ার অতি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র।'

'আরে এ আলোচনাটাই অর্থহীন,' বলে ওঠেন ভবতারণ, 'কারণ এরকম পরিস্থিতি দেখাই দেবে না।'

'যদি দেখা দেয়,' রাকেশ নিচু গলায় বলেন রায়াকে, 'কে জানে এসব ব্যবস্থা কাজে দেবে কি না।'

ওদিকে একটা মনিটর দেখিয়ে ন্যাট বলছেন, 'এটা কিন্তু কমপিউটারের পর্দা নয়। এটা দেখাচ্ছে ক্লোজড সার্কিট টিভি ক্যামেরাতে ধরা ছবি।'

মনিটরটাতে দেখা যাচ্ছে একটা বেড়ার খানিকটা অংশ। এক কোণায় ছোট হরফে লেখা রয়েছে—'পুবের বেড়া: টি-রেকস এলাকা'। পর পর অনেকগুলো মনিটরের দিকে তাকালেন সকলে। কোনোটিতে দেখা যাচ্ছে খোলা মাঠ, কোনোটিতে ব্র্যাকিওসরাসদের জলা, কোনোটিতে ভেলোসির্যাপটরদের চত্বরটা। একটাতে দেখা যাচ্ছে একটা জাহাজঘাট, সেখানে ধীরে ধীরে এসে ভিড়ছে একটা মালবাহী জাহাজ। 'ওটা আমাদের প্রধান ঘাট' বললেন ন্যাট, 'দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। পূব দিকে আরেকটা ছোট ঘাট আছে। তবে সেটা কমই ব্যবহার করা হয়। জাহাজেই আমাদের বেশির ভাগ মালপত্র আসে।'

'সব সময়ে এই মনিটরগুলোর উপর চোখ রাখা হয়?'

'আমরা হয়তো রাখি না, কিন্তু কমপিউটার ঠিক খেয়াল রাখে অষ্টপ্রহর। কিছু গোলমাল হলেই বিপদসঙ্কেত দিয়ে সজাগ করে দেয় আমাদের।'

'সব মিলিয়ে ক'টা ডাইনোসর আছে এখানে?'

'আপাতত আছে দশটা ব্র্যাকিওসরাস, একটা টিরানোসরাস,

একটা ডাইলোফসর, একটা ট্রাইসেরাটপস, তিরিশটা কমপসগনেথাস, বাইশটা গ্যালিমাইমাস, ছ'টা প্যারাসরোলোফাস এবং তিনটে ভেলোসিরাপটর। ও হ্যাঁ, একটা আরকেঅপটেরিকসও আছে।'

'নামগুলো বলতে তো দাঁত ভাঙার উপক্রম,' বলেন রাকেশ।

হাসেন ন্যাট, 'হ্যাঁ। তাই এখানকার কর্মীরা ওদের সকলের একটা করে ডাকনাম দিয়েছে। ব্র্যাকিওসরাসরা স্বভাবতই "ব্র্যাকি", টিরানোসরাস হল "টি-রেকস্", ট্রাইসেরাটপস হল "টপস্", কমপসগনেথাসরা হল "কমপি", ভেলোসিরাপটরদের সবাই বলে "র‍্যাপটর"।'

'আর নেই?' প্রশ্ন করেন অজিত।

'আছে, নার্সারিতে। তবে তারা এখনও বাচ্চা। তাদের এখনও ছাড়া হয়নি। এই তো আজই ডিম ফুটে বেরোবে শুনেছি আরও একটা।'

'হিসেবটা কে রাখে?'

'কমপিউটার। দেখবেন?'

একটা মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে বোতাম টিপলেন ন্যাট। সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় একটা চার্ট দেখা দিল। হিসেব করে দেখান হচ্ছে তাতে, কোন প্রজাতি ক'টা থাকার কথা এবং আছে ক'টা। একমাত্র কমপিদের হিসাব মিলছে না। ন্যাট বললেন, 'এদের নিয়ে এই হল গোলমাল। কোথায় কোন পাতার আড়ালে যে এরা লুকিয়ে থাকে। সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না। হয়তো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে। কমপিউটার প্রাণীদের খোঁজ রাখে "মোশন ডিটেক্টর" দিয়ে, যা নড়ে না তা দেখাও যায় না।'

'কমপিউটারেরও তাহলে দুর্বলতা আছে?' হেসে ওঠেন রাকেশ।

'ও কিছু নয়, প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর খোঁজ নেয় কমপিউটার, পরের বারই হিসেব মিলে যাবে দেখবেন।'

হঠাৎ ঘরের ওপাশ থেকে সুবোধ প্রামাণিক বলে ওঠে, 'দোষটা কমপিউটারের নয়, ওই ডিটেকটর যন্ত্রগুলোর। আমি তো আগেই বলেছি শুধু "মোশন ডিটেকটর" দিয়ে কাজ হবে না, সাথে "হিট স্ক্যানার" চাই। তা আমার কথা না শুনলে—'

তার কথা এক ধমকে থামিয়ে দেন ভবতারণ, 'তোমাকে কে

কথা বলতে বলেছে? নিজের কাজ কর। দিব্যি তো ফাঁকি দেবার ধান্দা করেছিলে।' সকলের দিকে ফিরে আবার বলেন, 'এই সুবোধ, হঠাৎ তর্ক তুললো, এটা করবো না ওটা করবো না, চুক্তি নাকি অন্যরকম হয়েছিল। আরও টাকা চাই। এখন বাঙ্ঘাধনকে টাইট করে দিয়েছি। চুক্তিপত্র অনুযায়ী কাজ না করলে বিরাট টাকা জরিমানা হবে, হাইকোর্টের এই রুলিং পেয়ে এখন দিব্যি কাজ করছে। আর প্রোগ্রামিং গোলমাল করার ওর ক্ষমতা নেই। ন্যাট উইভার বসে আছে মাথার উপরে, অতি সতর্ক নজর।'

কথাগুলো শুনে চুপ করেই গেল লোকটা। এমন কি, তেলতেলে একটা হাসিও হাসল। কিন্তু রায়া স্পষ্ট দেখলেন, ওর চোখের গভীরে কী যেন একটা দপ করে জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল চেষ্টা করে টেনে আনা ভদ্রতার আড়ালে। 'সর্ষের ভেতরেই ভূত!' স্বগতোক্তি করেন রাকেশ।

'এই সুবোধ প্রামাণিক,' আবার বলেন ভবতারণ, 'সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রোগ্রামিং করার কাজে অবশ্য খুবই দক্ষ, দেখে ওকে যতই হোঁৎকা মনে হোক না কেন। ভুলেও ভাববেন না ও বোকা, ওই দেখতে মোটা মাথার মধ্যে বুদ্ধি কিন্তু ক্ষুরধার। তবে ওর বিরাট দোষ হলো লোভ আর নোংরা হয়ে থাকার অভ্যাস।'

ভবতারণের এসব কথা শুনতে শুনতে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন সবাই। যেমন লোকই হোক না কেন, তার সামনে এভাবে কথা বলে সকলের চোখে তাকে হেয় করাটা বেশ অভদ্রতা। ভবতারণের ব্যবহার সম্পর্কে ক্রমশই সকলের মনে সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল। লোকটার দাদু দাদু চেহারার পিছনে মনটা খুব উদার বলে মনে হচ্ছে না আর।

রায়া তাকিয়ে দেখলেন সুবোধের দিকে। সত্যিই লোকটা কেমন যেন ঘৃণ্য। তার টেবিলের উপরে একপাশে পড়ে আছে আধখাওয়া একটা স্যান্ডউইচ, কতগুলো খালি বিয়ারের টিন। কাগজপত্র অগোছালো। তারই মধ্যে অত্যন্ত বেমানান ভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটা শেভিং ক্রিমের কৌটো। একটু অবাক লাগলেও টিনটার কথা একটু পরে আর রায়াব মনে রইল না। রায়া শুধু দেখলেন, ঘাড় গুঁজে কমপিউটাব কনসোলে কাজ করে যাচ্ছে লোকটা।

কী যে করছে তা যদি রায়া বুঝতেন তাহলে বুকের রক্ত তাঁর হিম হয়ে যেত।

'আরেকটা প্রশ্ন, ন্যাট,' বলেন রাকেশ, 'যদি আপনার এই সব ডাইনোসরদের মধ্যে একটা কোনোক্রমে এখান থেকে পালিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছয় অথবা ভারতীয় বা ওদিকে অন্য দেশের মেইনল্যান্ডে পৌঁছে যায়, তাহলে কী হবে?'

'এমন ঘটনা কিছুতেই ঘটবে না। এ দ্বীপ থেকে যেতে হলে হয় উড়তে হবে হেলিকপটারে, নাহলে ভাসতে হবে জাহাজে। প্রথমটা তো একেবারেই অসম্ভব আর দ্বিতীয়টাও প্রায় তাই। টিভি মনিটর সর্বদা ডকের উপর নজর রাখছে। তাছাড়াও জাহাজ দ্বীপ ত্যাগ করার আগে খুব ভালো করে তা তল্লাশি করে নেওয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা, বেড়ার বাইরে ওরা আসবে কী করে?'

ভবতারণ বলেন, 'বাকি বিষয়ে জানতে হলে এর পরের ঘরটাতে যেতে হবে। সেটা হলো আমাদের হ্যাচারি আর ইনকিউবেশন রুম। সেখানে আমাদের প্রধান বায়োইঞ্জিনীয়ার ডঃ অগাস্টাস লী আছে, সে বলবে সব বুঝিয়ে।'

এবারে ক'ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে ইনকিউবেশন রুম আর হ্যাচারি। লম্বাটে ঘরটায় ভীষণ গুমোট। একটাও জানলা নেই। কয়েকটা টেবিলের উপর শোয়ানো রয়েছে ছোট বড় নানান আকৃতির ডিম। ডিমগুলো খানিকটা ঢাকা পড়ে আছে একটা অদ্ভুত কুয়াশার আস্তরণে। কুয়াশা বেরিয়ে আসছে টেবিলগুলোর পাশে লাগানো নল থেকে। সমস্ত ঘরটা ইনফ্রারেড আলোয় রহস্যময়।

ডঃ লী বললেন, 'এ ঘরটার তাপমাত্রা নিরানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইট আর এর বাতাসের আপেক্ষিক আদ্রতা একশো ভাগ। অক্সিজেনও বাতাসে খুব বেশি।'

'তার মানে,' বলেন অজিত, 'ঠিক জুরাসিক আবহাওয়া?'

'হ্যাঁ, আমাদের তো অন্তত তাই মনে হয়। কারো যদি কষ্ট হয় বলবেন।'

'ডিমগুলো তৈরি হয় কীভাবে?'

'প্রথমে ভ্রূণগুলো তৈরি হয় টেস্ট টিউবে। তারপরে যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলোকে ডিমের ভেতরে পুরে দেওয়া হয়। ডিমের

খোলাগুলো পোরাস প্লাস্টিকের তৈরি। এক ঘন্টা পর পর ডিমগুলো ঘুরিয়ে উল্টে রাখা হয়। ঘোরানোর কাজটা করে রোবোট হাত। সব সময় কমপিউটার পরীক্ষা করে দেখে, ডিমের মধ্যে বাচ্চাটা কতটা বড় হলো। সময় হলে রোবোট ওপাশের টেবিলে নিয়ে ডিমটাকে রাখে। তারপর ডিম ফুটে বেরোয় ডাইনোসর। দেখতেই পাচ্ছেন ডিমগুলো ভাগ করে রাখা হয়েছে প্রজাতি অনুযায়ী।'

'এখানে একসাথে ক'টা ডিমে তা দেওয়া যায়?'

'সে প্রায় তিনশো। কিন্তু এখন আমরা খুব অল্প সংখ্যক ডিম নিয়ে কাজ করছি। ডাইনোসর পার্কের ব্যাপারটার আইনগত দিকের ঝামেলা মিটলে পুরোদমে কাজ শুরু হবে এখানে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই একজন কর্মচারী এসে ভবতারণকে আর ডঃ লীকে কিছু বলল। ভবতারণের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অজিতকে বললেন, 'অধ্যাপক বোস, এইবারে আপনাকে দেখাব এক আশ্চর্য জিনিস। ডাইনোসরের জন্ম।'

লী একটু হেসে বললেন, 'মিঃ চক্রবর্তি ডিম ফোটার সময় প্রত্যেক বার উপস্থিত থাকেন। এতবার দেখেও ওঁব সাধ মেটেনি।'

'মিটবেও না কোনোদিন। এরা যে সব আমারই মাথা থেকে বেরিয়েছে।'

ঘরটার এক প্রান্তে একটা গোল টেবিল। তার মাঝখানে একটা ডিম। মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। সকলে গোল হয়ে দাঁড়ালেন। লী বললেন, 'মাথা সামলে। সারাক্ষণ রোবোটের হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক করে গুঁতো খাবেন। উপরের আলোটাও খেয়াল করবেন।'

ভবতারণ নিচু হয়ে ডিমটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে একটা অনির্বচনীয় হাসি। ডিমটা এবারে বেশ জোরে নড়ে উঠল। অপেক্ষাকৃত সরু দিকটার একপাশে খোলাটা দেখে মনে হল ভিতরের চাপে ফুলে ফুলে উঠছে যেন। ভবতারণ অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, 'আয় মা, আয়! দে, জোরে ঠেলা দে! পারবি, এইবার পারবি!'

সারা ঘরে একটা চাপা উত্তেজনা। অজিতের সারা শরীর টানটান। রায়ার মুখে অপত্যস্নেহের ছায়া। রাকেশ চেষ্টা করেও অবহেলার ভাবটা মুখে ধরে রাখতে পারছেন না। সকলেই ব্যগ্র হয়ে দেখছেন কী হয়।

এবারে একটু ফাটল ধরল খোলায়। ভবতারণের উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। একটা টুকরো খুলে পড়ে গেল। ভিতর থেকে ঠেলা দেওয়ার শক্তি বাড়ছে ক্রমে ক্রমে। আরও কয়েকটা টুকরো খসে পড়ল। একটুখানি দেখা গেল একটা ছুঁচলো নাক আর ঠোঁটের অগ্রভাগ। আরও জোরে নড়ে উঠল গোটা ডিমটা। এক ধাক্কায় বেরিয়ে এল পুরো মাথাটা আর ছোট্ট দুটো হাত। ভবতারণ আর পারলেন না। হাত বাড়িয়ে ডিমটাকে ধরে আঙুল দিয়ে খোলার ফাঁকটা আরও বড় করে তুলতে শুরু করলেন। এইবার খোলাটা একদম ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দেখা গেল ডাইনোসরের ছানাব গোটা দেহটা।

ছ'ইঞ্চি মতো লম্বা দেহ। সবজে বাদামি চামড়ার রং। দেড় ইঞ্চি লম্বা মাথাটার প্রায় সবটাই হাঁ। সামনের ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো হাত নেড়ে ছোট মুখ হাঁ করে আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে সমস্ত শরীরে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে ছানাটা। পরম স্নেহে হাতে তুলে নিয়ে তুলো দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিতে লাগলেন ভবতারণ। বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন সকলে।

রাকেশ এতক্ষণে তাঁর স্বাভাবিক আমুদে ভাব ফিরে পেয়েছেন। মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন, 'কী হল, ভবতারণবাবু, ছেলে, না মেয়ে?'

ব্যস্ত ভবতারণ উত্তর দিলেন না। লী বললেন, 'মেয়ে।'

'কী করে বুঝলেন?'

'বোঝার কিছু নেই। এখানে সব ডাইনোসরই মেয়ে। সেই রকমই ব্যবস্থা করা আছে। খুব কিছু কঠিন কাজ নয়। ক্রোমোজোমগুলোকে একটু এদিক ওদিক করলেই হল।'

'তার মানে এখানে ডাইনোসরদের বংশবৃদ্ধির কোন উপায় নেই?' প্রশ্ন করেন রায়া।

'বিলকুল না। সেটা একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যেত। এমনিতেই আমি চেয়েছিলাম জিনগুলোকে চালাচালি করে মাংসাশী ডাইনোসরগুলোর হিংস্রতা একটু কমাতে। কিন্তু মিঃ চক্রবর্তি রাজি হননি।'

'রাজি হব কেন?' ভবতারণ মাথা না তুলেই বলে ওঠেন,

'যা স্বাভাবিক তাই তো ভালো। লোকে পয়সা দিয়ে এসে আফিম খাওয়ানো সার্কাসের বাঘ দেখে যাবে? না, কক্ষনো না। সকলকে আমি দেখাবো প্রকৃতির আদিম হিংস্র নির্দয় রূপ। আর প্রকৃতির নিয়মে খামোখা হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।'

হেসে ফেললেন অজিত। 'আপনি একথা বলছেন? প্রকৃতি নিয়ে একদম ছিনিমিনি তো খেলছেন মশাই আপনি নিজেই!'

'আর সব ক'টা ডাইনোসরকে মেয়ে করে রাখা প্রকৃতির নিয়মে হস্তক্ষেপ করা নয়?'

'সেটা তো প্রয়োজনে। অবাধ বংশবৃদ্ধি ঘটতে দেওয়া যায় না!'

'তাই বলে সব মেয়ে?' রাকেশ বলেন।

'কেন?' লী মজা পান, 'সমাজে যদি সবই মেয়ে থাকে আপনার আপত্তি আছে নাকি?'

'সে অন্য কথা। আপনারা ভাবছেন কেবল ক্রোমোজোম নিয়ন্ত্রণ করে আপনারা জীবনের গতি রুদ্ধ করবেন?'

'তা সব যদি একই লিঙ্গের প্রাণী হয় তাহলে প্রাণের এগোনো তো একটু সমস্যা হবেই।'

'হবে না। হতেই পারে না।' রাকেশ জোর দিয়ে বলেন, 'জীবনের গতি রোধ করা যায় না। জীবন ঠিক তার নিজের পথ করে নেয়। চিরদিন নিয়েছে, চিরদিন নেবে।'

ভবতারণ অবজ্ঞার হাসি হেসে বলেন, 'এখানে নিয়ন্ত্রণ বড় কড়া, মিঃ পাণ্ডে। বিজ্ঞান এখানে জীবনের চেয়েও শক্তিশালী।'

চুপ করে যান রাকেশ। যত সময় যাচ্ছে ততই ভবতারণ লোকটির হামবড়া ভাব তাঁর মনে বিরক্তি উৎপাদন করছে। প্রথম আলাপে যে সদালাপী অতিবিনয়ী লোকটিকে দেখা গিয়েছিল ভবতারণের মধ্যে, সে কোথায় গেল কে জানে!

ওদিকে অজিত বাচ্চা ডাইনোসরটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। হাঁয়ের ভিতরে কালচে জিভ, ডগার কাছে দু'ভাগে বিভক্ত। মাড়িতে এখনও দাঁত গজায়নি। ঘন কালো চোখও আধবোজা। এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডাকছে শিশু দানব। 'এটা বড় হবে কত দিনে?' অজিত জানতে চান।

'ডাইনোসরদের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তবয়স্ক হতে সময় লাগে দুই থেকে চার বছর। কৈশোরে পৌঁছে যায় বছর খানেকের মধ্যে।'

'এই বাচ্চাটা কোন প্রজাতির?'

একটা ফর্দ উল্টে দেখেন লী। দেখতে দেখতে বলেন, 'নাম মনে রাখাটা মহা ঝামেলা। তিনশো আটচল্লিশ রকম ডাইনোসরের সন্ধান পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত। এটা হল.... এটা হল একটা ভেলোসির‍্যাপটর।'

অজিতের মুখে কথা সরে না। তাঁর মনে পড়ে যায় মন্টানাতে সেই অসহ্য গরম দিনটার কথা। শুধু একটা চোয়াল খুঁড়ে বার করে তাকে পরিষ্কার করতেই কেটেছিল সারাটা সকাল। তারপর আরও দশ বারো দিন পরে বার করা গিয়েছিল কঙ্কালের বাকি অংশ। তার আগে 'কমপিউটার অ্যাসিস্টেড সোনিক টোমোগ্রাফি'-র সাহায্যে গোটা কঙ্কালটা দেখে নেওয়া হয়েছিল। একটা কামানের মতো যন্ত্রের সাহায্যে একটা নরম শিসের গোলা দিয়ে মাটির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তার ফলে যে ভূকম্পন হয় তার তরঙ্গগুলো মেপে মেপে আশপাশের ভূগর্ভের মানচিত্র আঁকে কমপিউটার।

যে কঙ্কালটা পর্দায় দেখেছিলেন অজিত সেটা ছিল একটা শিশু ভেলোসির‍্যাপটরের। ঘাড়টা পিছন দিকে বেঁকে আছে। কোমরের নিচে পিউবিক অঞ্চলের হাড় পিছন দিকে ঘোরানো। সামনের পা দুটো ছোট। মুরগির ডানার মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে পাখির মতো উড়ে যেতে চাইছে ডাইনোসরটা। মনে হওয়াটা যে খুব অস্বাভাবিক তা নয়, কারণ ডাইনোসরদের সঙ্গে পাখিদের খুবই মিল ছিল। 'র‍্যাপটর' কথাটার মানেই তো শিক্‌ড়ে পাখি। ভেলোসির‍্যাপটরদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পায়ের ছ'ইঞ্চি নখটি যা তার শিকারকে নিমেষে ফালা ফালা করে দিত। কঙ্কালটিতে সেই নখটা অবশ্য একটা গোলাপ কাঁটার চাইতে বড় বলে মনে হচ্ছিল না।

অজিত তাকালেন তাঁর হাতে ধরে রাখা বাচ্চাটার দিকে। ক'দিন পরেই তো এ হয়ে উঠবে ভয়াবহ দানব। এক এক বারে নিজের ওজনের পঁচিশ ভাগ পরিমাণ মাংস খাবে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো

করবে যাকে হাতের কাছে পাবে তাকে। আকারে তুলনায় ছোট হলেও এরা ছিল জুরাসিক যুগের হিংস্রতম মাংসাশী প্রাণী। কিন্তু সেটা তো ওদের প্রকৃতি, দোষ কিছু নেই তাতে।

আর কি! ভাবলেন অজিত, এবারে তো জীবাশ্মবিদদের ভাত মারা গেল। কুড়ি কোটি বছর আগে বিলুপ্ত প্রাণীকে গবেষণাগারে তৈরি করতে পারলে কে দেখতে যাবে মাটির তলায় শুকনো হাড়ে কী আছে! দরকারই হবে না!

'কী ভাবছেন?' লীর ডাকে সম্বিত ফেরে অজিতের। প্রশ্ন করেন, 'ডিএনএর নকশা পাঠ করার পরে তা থেকে কোন ডাইনোসর প্রজাতি রূপ নেবে সেটা কী করে বোঝেন আপনারা?'

'দুটো পদ্ধতি আছে। ডিএনএ অন্য সব কিছুর মতোই সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়। ডিএনএর একটা টুকরো নিরীক্ষণ করে কমপিউটার বলে দিতে পারে বিবর্তনের কোন পর্যায়ে তার স্থান হবে। সময় লাগে বটে, কিন্তু কাজটা করা কিছু অসম্ভব নয়।'

'অন্য পদ্ধতিটা কী?'

'কী আর! ডিমের মধ্যে আন্দাজে বাড়তে দিই। দেখি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়। খানিকটা "যা থাকে কপালে" গোছের ব্যাপার বলতে পারেন। যেমন, দেখুন ওই টেবিলটাতে। নতুন পাওয়া কিছু ডিএনএ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমবার ব্যবহারে কোন প্রজাতি বেরোবে বলা মুশকিল হয়, তাই লিখে রাখা হয়েছে—'সম্ভবত স্টেগোসরাস।'

'এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করতে অস্বস্তি লাগে না? ধরুন যদি যে-প্রাণীটা জন্মালো তার মধ্যে কোন বিকৃতি থাকে?'

'অস্বস্তি লাগে খানিকটা। তবে তার মধ্যেও একটা উত্তেজনা আছে। আর বিকৃতি থাকলে ওই বিশেষ প্রাণীটাকে নষ্ট করে ফেলে নতুন করে কাজ করা হয়।'

'ডঃ লী, আপনি এই ডাইনোসর পার্ক ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত হলেন কী ভাবে?'

'পাঁচ বছর আগে হার্ভাডে গবেষণা সেরে ভাবছিলাম ওখানেই একটা রিসার্চ প্রোজেকটে ঢুকবো। এমন সময় মিঃ চক্রবর্তি এলেন একদিন আমার কাছে। বললেন, সরকারি নিয়ন্ত্রণ আর অর্থনৈতিক

অভাবমুক্ত কাজের পরিবেশ দেবেন, দেবেন সব চাইতে অগ্রসর যন্ত্রপাতি আর গবেষণাগার। টাকার কোনো অভাব থাকবে না, থাকবে না কোনো উপরওয়ালার খবরদারি। মনোমত কাজ করতে পারবো। সাথে পাবো বৈজ্ঞানিক হিসেবে অমরত্ব লাভের সুযোগ। অমরত্বের কথা জানি না, তবে কাজের অসীম সুযোগ পেয়েছি, করেওছি কিছু কাজ। কেমন কাজ তা তো দেখছেনই। অবশ্য,' একটু হাসলেন লী, 'খবরদারি যে একেবারে নেই এমন নয়। তবে যে গরু দুধ দেয় তার চাট একটু আধটু তো সহ্য করতেই হবে।'

কখন যে রাকেশ এসে পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁদের কথা শুনছিলেন তা কেউ খেয়াল করেননি। তিনি প্রশ্ন করলেন এবার, 'আচ্ছা ডঃ লী, এখানে কাজের অবাধ সুযোগ পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কাজটার নৈতিক ভালোমন্দ নিয়ে ভেবেছেন কখনও? আপনার এই সৃষ্টির কী ফল হতে পারে, কী প্রভাব পড়তে পারে সমাজের উপর, তা নিয়ে চিন্তা করেছেন কোনো সময়ে?'

'দেখুন, আমি বৈজ্ঞানিক। নীতি নিয়ে চিন্তা করার আমার সময় নেই। আর সমাজের উপর প্রভাব? তা, ভালো ছাড়া খারাপ কিছু হবে বলে মনে হয় না আমার।'

রাকেশ মাথা নাড়েন। এদের সকলকেই এখন ক্ষমতার নেশা পেয়ে বসেছে। বোঝানো যাবে না। নীতি নিয়ে ভাববে না বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করবে না, শিল্পী বিজ্ঞান জানবে না, সকলে কেবল নিজের নিজের বিষয়ের বিশিষ্টতার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকবে, এই হল জীবন সম্পর্কে এদের হিসাব। এরাই আবার প্রাণ সৃষ্টির খেলায় মেতে উঠেছে। যুগান্তকারী সৃষ্টি এদের কাছে নাম কেনার, অর্থ উপার্জনের এবং আত্মাভিমান চরিতার্থ করার উপায় মাত্র।

'কী হল আপনাদের?' ভবতারণের গলা শোনা যায় পিছন থেকে। 'চলুন, দুপুরের খাওয়া সারবেন। এখনও তো পার্কের ভেতরেই ঢোকেননি!'

কনট্রোল রুমের মধ্যে দিয়ে ফিরে চললেন সকলে খাওয়ার ঘরের দিকে। অজিত দেখলেন, একটা কমপিউটার মনিটরে চলতে

দেখা যাচ্ছে ডাইনোসরদের মাথা গোণার কাজ। সামনে কেউ বসে নেই। কমপিউটার হিসাবে দেখাচ্ছে ছ'টা পারাসরোলোফাস থাকার কথা, রয়েছে সাতটা; কমপসগনেথাস থাকার কথা তিরিশটা, রয়েছে পঁয়ত্রিশটা; গ্যালিমাইমাস থাকার কথা বাইশটা, রয়েছে পঁচিশটা। কী ব্যাপার? মনে পড়ল, ঢোকার সময়ে দেখেছিলেন, হিসাবের চেয়ে কমপসগনেথাস একটা কম রয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে পাঁচটা বেশি। অজিত নিজে কমপিউটারের কারিকুরি বিশেষ বোঝেন না, তাই ওই যন্ত্রটার উপর তাঁর আস্থা কম। নিশ্চয় ভুল করছে যন্ত্রগণক, এই ভেবে তখনকার মতো অজিত ভুলে গেলেন ব্যাপারটা।
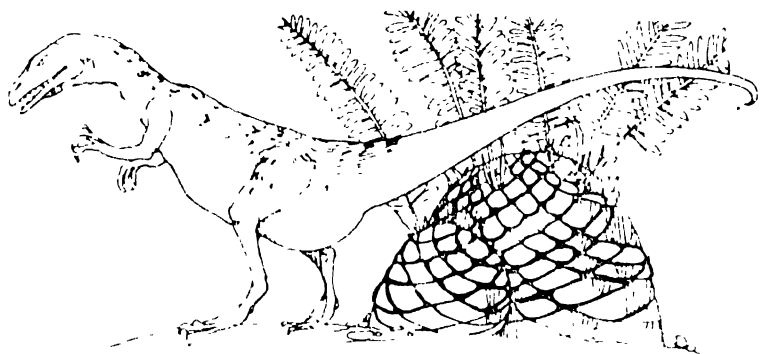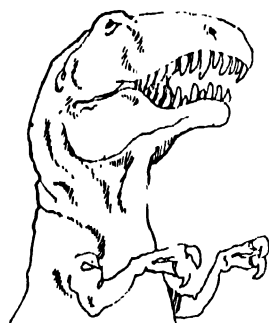
বিপদ আসবেই

সকাল থেকেই সুবোধ প্রামাণিক ব্যস্ত। রাত্রের মধ্যেই কাজটা সারতে হবে। অথচ নিজের তৈরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বানচাল করে দিতে নিজেকেই বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। পরতে পরতে সাজানো আছে কমপিউটারের প্রহরার জাল। একটা স্তর থেকে আরেকটা স্তর ক্রমানুসারে চলে তবেই সমগ্র ব্যবস্থাকে অতিক্রম করা সম্ভব। হুট বলতেই বোতাম টিপে সবটাকে নাকচ করা যায় না। পাশ কাটিয়ে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই। প্রোগ্রামিং নাকচ করার জন্যেও আলাদা প্রোগ্রাম বানাতে হচ্ছে। এগোতেও হচ্ছে খুব গোপনে। নাহলে ধরা পড়ে যেতে হবে।

সুখের বিষয়, কমপিউটারের মূল প্রোগ্রামেই কিছু ত্রুটি আছে। এত বড় ব্যবস্থা, ত্রুটি থাকতেই পারে। সেই ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার কাজ চলছে ক'দিন ধরেই। সেই কাজের বাহানায় ব্যবস্থার অনেক গভীরে ঢুকে পড়ার সুযোগ আছে। ত্রুটি সংশোধনের নামে এখানে ওখানে হস্তক্ষেপ, এটাওটা বন্ধ করে রাখা, দিব্যি অনুমতি নিয়েই এসব সম্ভব হচ্ছে। আরও সৌভাগ্যের বিষয়, ঠিক এরকম কোনো পরিস্থিতির কথা ভেবেই সুবোধ প্রথম থেকে সুরক্ষাজালে একটা ছিদ্রপথ বানিয়েই রেখেছিল। সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে

কমপিউটারের অনেকগুলো নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দেওয়া যাবে। কিন্তু সুরক্ষাজালের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছবার জন্যে অনেকগুলো স্তর পেরোতে হবেই।

তাছাড়া, কেবল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে গন্তব্যে পৌঁছনোই তো সুবোধের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কেবল সেটুকুতে তার মন ভরবে না। ভবতারণের চূড়ান্ত সর্বনাশ করতে হবে। কিছু নিরপরাধ ব্যক্তি তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঠিকই, কিন্তু কী করা যাবে! ডিমের খোলা না ভাঙলে ওমলেট হবে কী করে, থুড়ি, ডাইনোসর জন্মাবে কী করে!

সুতরাং কাজ করে চলে সুবোধ প্রামাণিক। থলথলে শরীর ঘামে একেবারে ভাসছে যেন। টিন টিন বিয়ার খেয়েও তেষ্টা মিটছে না। দ্বিপ্রাহরিক আহার এখনও হয়নি। অথচ ওঠার সময় নেই। টানা থেকে একমুঠো চকলেট বার করে মুখে পোরে সে। হাতটা মুছে নেয় প্যান্টে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, জীবাশ্মবিদ অজিত বোস একটা মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে কী যেন দেখছে।

রায়ার ডাকে অজিত মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে চলেন খাওয়ার ঘরের দিকে। ভীষণ অধৈর্য লাগছে। পার্কের ভিতরে ঢোকা হবে কখন। মনের মধ্যে অবশ্য একটা অস্বস্তিও ঘুলিয়ে উঠছে। রাকেশের অব্যক্ত সমালোচনা তাঁর মনেও নানা রকম প্রশ্ন তুলছে।

টেবিলে পৌঁছে অজিত দেখলেন সকলেই বসে পড়েছে। বেয়ারা খাবার পরিবেশন করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি বসতেই রায়া বাদে সবাই খেতে আরম্ভ করল। রায়া প্লেটে হাত দিচ্ছেন না দেখে ইশারায় কারণ জানতে চাইলেন তিনি। একই রকম ইশারায় রায়া উত্তর দিলেন, গা গোলাচ্ছে। অজিত বুঝলেন, র‍্যাপটরদের খাওয়ার দৃশ্যটা ভুলতে পারছেন না শ্রীমতী।

ভবতারণ সবার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'কেমন দেখলেন এ পর্যন্ত?'

'ভালোই', উত্তর দেন রাকেশ।

'সে কী মশাই, শুধু ভালো? আরে, ভালো করে ভালো বলুন!'

'দারুণ জমিয়ে ফেলেছো হে ব্যাপারটা,' চার্লসের গলায় প্রচণ্ড উৎসাহ, 'লাস ভেগাসের চাইতেও জায়গাটা মনে হচ্ছে লাভজনক হবে।'

ভবতারণ তৃপ্তির হাসি হাসেন। চার্লস বলে চলেন, 'যা খুশি টিকিটের দাম করতে পারো। যা চাইবে তাই দেবে লোকে। এক হাজার ডলার, পাঁচ হাজার ডলার, যা চাইবে। আর সেখানেই তো শেষ নয়, হোটেল ভাড়া, খাবারের দাম, নানা রকম স্যুভেনিরের দোকান, আরও এরকম অনেক রোজগারের কায়দা বার করা যাবে। একটা ছোটখাট ক্যাসিনোও চালু করা যেতে পারে। আচ্ছা, তোমরা ছোট আকারের পোষার উপযোগী ডাইনোসর একটা দুটো বানাতে পার না? অসাধারণ হবে কিন্তু।' চার্লস উৎসাহে একেবারে টগবগ করতে থাকেন।

'ডাইনোসরের "বনসাই" বলছেন?' রাকেশ তির্যক হাসি হাসেন।

বিরক্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ভবতারণ বলেন, 'ডাইনোসর পার্ককে খেলো করে তুলবো না। তবে তোমার কথাগুলো মন্দ নয়।'

'সে কী, ভবতারণবাবু, সারা পৃথিবীর শিশুদের জন্যে নাকি আপনার এই প্রাগৈতিহাসিক উদ্যান? অত অত ডলার টিকিটের দাম করলে ক'টা শিশু আসবে এখানে?'

'দেখুন, এটা দানসত্র নয়। এ পার্ক ভিখিরিদের জন্যেও নয়। ভালো জিনিষ দেখতে হলে মূল্য তো দিতেই হবে। ওসব কথা বাদ দিয়ে বলুন এবার মিঃ পাণ্ডে, আপনার কেমন লাগছে?'

একটু চুপ করে রইলেন রাকেশ। তারপর বললেন, 'মিঃ চক্রবর্তি, একজন সাংবাদিক হিসেবে ডাইনোসর পার্ক দেখে আমি খুবই উল্লসিত। মূলত আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, অঙ্কের লোক। সে হিসেবেও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এই নবতম চেহারা আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু আমি নানা ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ছি কতগুলো কারণে যেগুলো শুনলে আপনি খুশি হবেন না।'

'বলেই দেখুন না, আমাকে খুশি করার তো কোনো দায় নেই আপনার।'

'আমার মনে হচ্ছে আপনারা যে বিরাট শক্তিকে এখানে মুক্ত

করে দিয়েছেন তা বোতলের জিন-এর মতো আপনাদের আমাদের সকলেরই শেষ পর্যন্ত ক্ষতি করবে। কোটি কোটি বছর আগে বিলুপ্ত প্রাণীদের পুনরায় সৃষ্টি করে আপনারা খুব দায়িত্ববোধের পরিচয় দেননি।'

'কেন? আমরা তো যেখানে সেখানে যা খুশি করিনি। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যা করার করছি।'

'নিয়ন্ত্রণ? কাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? আপনি বারে বারে এ জায়গাটাকে চিড়িয়াখানা বলেছেন, কিন্তু চিড়িয়াখানায় যে সব প্রাণী থাকে তারা আমাদের জানাচেনা, তাদের জীবনযাত্রা স্বভাব চরিত্র আমাদের পরিচিত। তাদের তাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু এই প্রাণীদের সম্পর্কে কিছুই জানা নেই, সবটাই আন্দাজ আর ধারণা, তাও জীবাশ্ম দেখে। এদের কী করে নিয়ন্ত্রণ করবেন আপনারা? আর নিরাপত্তা ব্যবস্থা? সেটা তো এখানে নির্ভর করছে কমপিউটারের জটিল সুরক্ষা ব্যবস্থার উপরে। জটিল ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ে তখন একেবারে হুড়মুড় করে পড়ে।

'আমার ধারণা জটিল ব্যবস্থা এক সময় না এক সময় ভেঙে পড়তে বাধ্য। তার মধ্যে কোনো না কোনো একটা ছোট্ট অংশে গোলমাল দেখা দিলে সেটা অত্যন্ত দ্রুত আয়তনে এবং গুরুত্বে বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ে। এখানেও তেমন একটা কিছু ঘটবে। কোথাও না কোথাও ব্যবস্থার মধ্যে ফাঁক থাকবেই এবং সেই ছিদ্রপথে বিপদ আসবেই।'

ভবতারণ হাত নেড়ে অবহেলার ভঙ্গিতে বলেন, 'এসব কথার কোন অর্থ হয় না। এখানে কোনো ব্যবস্থায় কোনো ব্যর্থতা দেখা দেবে না। তেমন কোনো ছিদ্রপথ এখানে নেই। আসলে কী জানেন, এই ডাইনোসররা বিপদজনক বলেই আপনারা ভড়কে যাচ্ছেন। যদি আমি এখানে একটা একশৃঙ্গ গন্ডার বানাতাম বা তুষার চিতা বানাতাম একটা তাহলে আপনারা কেউ কিছু বলতেন না।'

'তুলনাটা কিন্তু সঠিক হল না, ভবতারণবাবু', রায়া বলে ওঠেন। 'বন উচ্ছেদের ফলে অথবা কতগুলো গৃহনির্মাণ প্রকল্পের ফলে

অথবা শিল্পায়নের ফলে কিংবা মানুষের নৃশংসতার ফলে বিলুপ্ত কোনো প্রাণীর সঙ্গে ডাইনোসর পার্কের বাসিন্দাদের তুলনা চলে না। এরা বিলুপ্ত হয়েছে প্রকৃতির অমোঘ বিধানের ফলে, প্রকৃতির নিয়ম এদের পৃথিবীর বুকে টিঁকে থাকতে দেয়নি। তাদের আবার বাঁচিয়ে তোলা সরাসরি প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। এর ফল কী হবে কে বলতে পারে?'

'এ আপনারা কী বলছেন?'

'খুব ভুল বলছি না, মিঃ চক্রবর্তি।'

রাকেশ আবার বলেন, 'কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আর একটা কথা না বলে পারছি না। যখন কোনো একটা নতুন আবিষ্কার ঘটে তখন তার পিছনে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন আর কঠোর মানসিক শৃঙ্খলার একটা ইতিহাস থাকে। এই শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো বড় সৃষ্টি সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই আবিষ্কার যখন প্রযুক্তিগত চেহারা নিয়ে বাজারে বিক্রি হয় তখন যাঁরা সেই আবিষ্কার তৈরি অবস্থায় কিনে নেন তাঁরা জিনিসটা পান বিনা পরিশ্রমে, কেবল অর্থের বিনিময়ে। এইভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান অথবা প্রযুক্তির প্রয়োগ সব সময়েই খানিকটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্মে পর্যবসিত হয়। প্রতিভাবানদের কাঁধে বসে ফায়দা লোটেন আপনাদের মতো ব্যবসায়ীরা আর প্যাকেটে করে বেচেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রকৃতির বিস্ময় আর প্রযুক্তি বিদ্যার ম্যাজিক। ঠিক যেমন এখানে করছেন। এখানে প্রকৃতির ভয়াল রূপের সামনে মাথা নত হয়ে আসছে না আপনাদের, আপনারা হিসেব কষছেন মুনাফা বাড়াবার উদ্দেশ্যে। এ আবিষ্কার নয়, এ হল প্রকৃতিকে চূড়ান্ত অপমান করা।'

'আশ্চর্য!' ভবতারণের মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে, 'আপনি কী করে সাংবাদিকতা করেন কে জানে! সামান্যতম মনের প্রসারতা নেই আপনার। আগে থেকেই বিচার করে বসে আছেন। এখনও তো পার্কটা দেখেনই নি আপনি।'

'আগেই বলেছিলাম আমার মত আপনার ভালো লাগবে না। তবে চিন্তা করবেন না, লেখার সময় নিরপেক্ষ বিবরণই দেবো। অবশ্য আমার দুশ্চিন্তার কথাও বাদ দেবো না।'

ভবতারণ এবার ফেরেন অজিতের দিকে। বলেন, 'অধ্যাপক বোস, এঁদের সকলের মধ্যে আপনিই এখানকার সবকিছু সব চাইতে ভালো বুঝবেন। আপনি নিশ্চয় এদের মতো আমার সৃষ্টির প্রতি কটাক্ষ করবেন না।'

'কী জানি,' উত্তরে বলেন অজিত, 'বুঝতে পারছি না। তবে আশঙ্কা আমার মনেও উঁকি দিচ্ছে। এই প্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে কোটি কোটি বছর আগে। এই সময়টা যে ঠিক কতটা দীর্ঘ তা বোঝার ক্ষমতাই মানুষের প্রায় নেই। এমন একটা বিশাল সময়ের ব্যবধানে সে যুগের প্রাণীদের সম্যক বুঝতে পারা কি আদৌ সম্ভব? আর সেই প্রাণীদেরই সঙ্গে মোলাকাত হতে চলেছে মানুষের! ফল কী হবে কেউ বলতে পারে না।'

'অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য! একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, দু'জন তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি, তাদের কেউ আমাকে বুঝলো না, সমর্থন করল না! ধন্য মশাইদের শিক্ষাদীক্ষা। চোখে ঠুলি পড়ে থাকেন নাকি আপনারা?'

সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। ভবতারণ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলে যেতে লাগলেন ডাইনোসর পার্কের ভবিষ্যত গরিমার কথা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কী ভাবে তিনি আরও গোটা কতক দ্বীপ ইতিমধ্যেই ইজারা নিয়েছেন এই পার্কের আরও শাখা স্থাপনের জন্যে। বলতে বলতে ধীরে ধীরে মাথা ঠাণ্ডা হতে লাগল তাঁর। আবার অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামীর ভূমিকায় ফিরে এলেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর কথা ছাপিয়ে শোনা গেল দ্রুত ছুটে আসা কয়েকটা পায়ের শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে খাবার ঘরের দরজার সামনে দেখা দিল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ভবতারণের দিকে চোখ পড়তেই 'দাদু, দাদু' বলে ছুটে এসে দু'দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরল দু'জনে। ভবতারণের মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'এতদিন যাওনি কেন, দাদু, আমাদের বাড়ি?'

'হেলিকপটার পাঠাতে দেরি করলে কেন?'

'মা আসতে দিচ্ছিল না, জানো দাদু!'

'তুই চুপ কর! ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে! মা তো বারণ করবেই তোকে।'

'এক চড় মারব, বাঁদর।'

'আরে থাম, থাম, থাম। যাই হোক, এসে পড়েছ যখন আর ভাবনা নেই। এবার সব দেখবে।'

রায়া স্মিতমুখে দেখছিলেন বৃদ্ধ আর শিশুদের পারস্পরিক স্নেহের প্রকাশ। ভবতারণ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই হলো দীপ আর এই হলো রিতি। আমার নাতি-নাতনি। আমারই মতো আরও দুই ডাইনোসর পাগল। আমার ডাইনোসর পার্কের আসল দর্শকদের প্রতিনিধি। এদের মতো আরও হাজার হাজার শিশু-বালক-বালিকা আর কিশোর-কিশোরীতে ছেয়ে যাবে একসময় আমার পার্ক। ওদের এখানে এনেছিলাম এমনি পার্কটা দেখাব বলে। এখন ভালোই হলো, আপনাদের ভীতি কাটানোর জন্যেও ওরা কাজে লাগবে। ওরাও আপনাদের সঙ্গে পার্কে ঢুকবে। সেটাই প্রমাণ করে দেবে আমার ডাইনোসর পার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি আমার কতটা আস্থা আছে। আপনারা বুঝবেন আমি কতটা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি যে এই পার্কে কারো কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। তা নাহলে নিজের নাতি-নাতনিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতাম না নিশ্চয়।'

রিতির বয়স বারো। দীপের নয়। দু'জনেই খুব গম্ভীর ভাবে হাত তুলে নমস্কার করল সকলকে। দু'জনেই চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে। অজিতের পরিচয় শুনে দীপ সোজা গিয়ে ওঁর হাত ধরে দাঁড়াল। আর ছাড়ে না। লাজুক মুখে তাকিয়ে রইল রিতি। ভবতারণ বললেন, 'ওদের দু'জনের মাথাই ডাইনোসরে ভরা। একেবারে পাগল। আমারই নাতি-নাতনি তো! সারাক্ষণ এ বিষয়ে নানা রকম বই পড়ে যাচ্ছে। আপনি ভেলোসির‍্যাপটরের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছিলেন শুনে থেকে ভাই বোন আপনার পরম ভক্ত।'

অজিত শুনে যে খুব খুশি হলেন তা নয়। বাচ্চাদের বড় একটা পছন্দ করেন না তিনি। তাঁর মনে হল, আবার একটা ঝামেলা জুটল। নিশ্চিন্তে পার্কটা দেখা যাবে না। বকবক করে সঠিক পর্যবেক্ষণে বিঘ্ন ঘটাবে এরা। তাই রায়াকে ইশারায় ডেকে বললেন, ওদের সরিয়ে নিতে ওঁর কাছ থেকে।

এখনও পর্যন্ত তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নিঃসন্তান। রায়ার তাই বাচ্চাদের

প্রতি একটা আকর্ষণ আছেই। খুশি মনেই তিনি রিতি আর দীপকে কাছে ডেকে ওদের পড়াশুনা, বাড়িঘর, মা-বাবা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। ওরা অবশ্য এসব প্রশ্নে খুব মনসংযোগ করতে পারছিল না। একটু পরেই শুরু হবে পার্কে বেড়ানো, ওরা ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিল। 'চলুন এবার।' ভবতারণ ডাকলেন সবাইকে। 'বাইরে এতক্ষণে গাড়ি এসে গেছে নিশ্চয়।'

এক ছুটে বেরিয়ে গেল বাচ্চা দুটো। পিছনে পিছনে এগোলেন বাকি সকলে। বাইরে এসে গেছে গাড়ি। বড় বড় দুটো টয়োটা ভ্যান। ভিতরে অনেকটা জায়গা, পাঁচ ছ'জন বসতে পারে। একটা ছোট কমপিউটার পর্দা আর একটা টেলিভিসন পর্দা রয়েছে সামনে। তাছাড়া আছে একটা ওয়াকি-টকি, একটা রেডিও ট্রানসমিটার, বড় বড় জানলা কাঁচে ঢাকা। ছাতটাও কাঁচ। মাথার উপরে চারটে ছোট ছোট সার্চলাইট বসানো। দুটো অ্যানটেনাও লাগানো রয়েছে। নিচের অংশ হালকা সবুজ রং করা। উপরের দিকটা সাদা। গায়ে লেখা 'ডাইনোসর পার্ক'।

'আমি চালাচ্ছি,' বলে চার্লস উঠলেন সামনের গাড়িটাতে চালকের আসনে।

'চালাতে হবে না কাউকে, এ গাড়িগুলো নিজেই চলে ওই লাইন থেকে পাওয়া কমপিউটারের নির্দেশ অনুযায়ী।' ভবতারণের আঙুলের দিশা অনুসরণ করে দেখলেন সবাই, রাস্তার মাঝখানে একটা রেল লাইনের মতো লাইন বসানো রয়েছে আর সেটা চলে গেছে রাস্তাটা ধরে সোজা উত্তর মুখে। 'ওটা গেছে একেবারে ডাইনোসর পার্কের বড় ফটক অবধি।'

'আসুন সবাই, উঠে পড়ুন,' চার্লস ডাকলেন। 'দেরি করছেন কেন?'

সবাই একে একে উঠলেন গাড়িতে। সামনের গাড়িটাতে উঠল চার্লসের সঙ্গে রিতি আর দীপ। পরেরটায় সামনে বসলেন রায়া, পিছনে অজিত আর রাকেশ।

'এগোন আপনারা। আমি সব খেয়াল রাখবো আমার মনিটরে,' বলে ভবতারণ ফিরে গেলেন আবার কনট্রোল রুমের দিকে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সচল হল ভ্যান। সঙ্গে সঙ্গে কমপিউটার আর টেলিভিশন

পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। আর একটা কণ্ঠস্বর লুকোনো স্পিকার থেকে বলতে শুরু করল: "ডাইনোসর পার্ক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আপনাদের জানাই সাদর সম্ভাষণ। যা আপনারা দেখতে চলেছেন তার সামনে পৃথিবীর যে কোনো আশ্চর্য বস্তুই ম্লান হয়ে যেতে বাধ্য। আপনারা দেখবেন সেই সব মহাকায় পরম শক্তিধর প্রাণীদের, সেই সব অতিকায় সরীসৃপদের, যারা আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে ছিল এই পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। শুনবেন টিরানোসরাসের গর্জন, দেখবেন ভেলোসির‍্যাপটরের শিকার ধরা, শিহরিত হয়ে তাকিয়ে থাকবেন ট্রাইসেরাটপসের তিনটি শৃঙ্গের দিকে। আকাশে দেখবেন হাওয়ায় ভাসছে আরকেঅপটেরিকস্ আর টেরোডাকটিল। মাঠে ছুটে বেড়াবে গ্যালিমাইমাস।'

ইতিমধ্যে রাস্তাটা বাঁদিকে একটা বাঁক নিয়েছে। খানিক দূরে দেখা গেল একটা বিরাট দরজা। তারই দিকে এগিয়ে চলেছে ভ্যান দুটো। দরজার দু'পাশে আর মাথায় সারি সারি জ্বলছে মশাল।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা প্রবেশ করবো এমন এক জগতে যেখানে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হবে নির্দয় প্রকৃতি, যার দাঁত নখে রক্ত, যে ক্ষমাহীন, আদিম হিংস্রতা যার জীবনের মূল মন্ত্র। ভদ্রমহোদয়গণ, ভদ্রমহিলাবৃন্দ, প্রিয় শিশুর দল, আসছে দেখুন, ডাইনোসর পার্ক।'

ঠিক যেন মন্ত্র উচ্চারিত হল। নিঃশব্দে খুলে গেল বিশাল দুই পাল্লা। সোজা রাস্তা ঢুকে গেছে ভিতরে। চকচক করছে রাস্তার মাঝে রেলের লাইন। সবাই চুপ। কেবল পাখির ডাক আর বাতাসের শব্দ। কী ঘটবে এবার, কী দেখা দেবে? বিস্ময়ে প্রত্যাশাকম্পিত বক্ষ নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন সকলে।
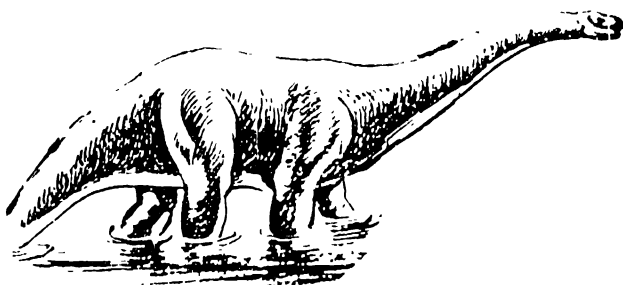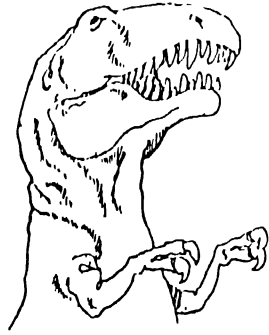
টিরানোসরাস কোথায়?

সুবোধ প্রামাণিকের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এখন আর দুটো একটা ঝামেলা মিটিয়ে নিলেই ব্যস। 'একজিকিউট' বোতামটা টিপলেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কনট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে মাটির তলার ঘরটা থেকে মাল সরিয়ে পার্কের ভিতর দিয়ে জিপে পুবের জাহাজঘাট পৌঁছতে তার সময় লাগবে হিসাব মতো মিনিট আঠারো। তারপর দ্রুতগামী মটর বোটে মাঝসমুদ্রে জাহাজে উঠতে আরও দশ পনেরো মিনিট। এই সময়টা কেউ কিছু টের না পেলেই হল। তারপরে তাকে আর কেউ ছুঁতেও পারবে না।

এই সময়টুকুর ব্যবস্থাও করে ফেলেছে সুবোধ। কখনও কখনও ত্রুটি সংশোধন করার জন্য কমপিউটার নিজেই গোটা ব্যবস্থার কিছু কিছু অংশ বন্ধ করে নেয়। দ্বীপের টেলিফোন ব্যবস্থায় কিছু গোলমাল আছেই। সেটা সারাবার জন্যে তার সঙ্গে যুক্ত অন্য কোনো কোনো ব্যবস্থাও বন্ধ করতে হতে পারে। তেমনই একটা মেরামতির নামে কিছু রাস্তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বন্ধ করে নেবার পথ সাফ করে নিয়েছে সুবোধ। সামান্য কয়েকটা ধাপ আর সাজাতে হবে। হাতে সময় আছে যথেষ্ট। ভাববার কিছু নেই। এরপরে ভাববে ভবতারণ। কপাল চাপড়ে, হা-হুতাশ করতে করতে ভাববে

বুড়ো বজ্জাত।

ভবতারণ, অ্যালান আর ন্যাট তখন কনট্রোল রুমে বসে মনিটরে লক্ষ করছেন কীভাবে ভ্যান দুটো পার্কের মধ্যে এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। সব কিছুই চলছে পরিকল্পনা মাফিক। ন্যাট দেখছেন বিভিন্ন পর্দায় কমপিউটার কী করছে না করছে। হঠাৎ একটা টেলিফোন বেজে উঠল। বাইরের লাইনে কেউ কথা বলতে চাইছে। ন্যাট ফোনটা তুললেন। কথা শুনে তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে একটা বোতাম টিপে আবহাওয়া স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগটা চালু করলেন তিনি। দেখা গেল মহাকাশ থেকে তোলা ভূপৃষ্ঠের চলমান ছবি। একটা বিরাট ঝড়ের মেঘ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। ভবতারণকে বললেন ন্যাট, 'মিঃ চক্রবর্তি, সমস্যা দেখা দিতে চলেছে।'

'কী হল ?'

'একটা ঝড় আসছে। ঘন্টায় পঁয়ষট্টি মাইল গতিতে। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে।'

বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন ভবতারণ। 'কতক্ষণে এসে পৌঁছবে এখানে ?'

'নির্ভর করছে নিম্নচাপের এগোবার পথের নতিমাত্রার উপর। তবে মনে হয় ঘন্টা তিনেক লাগবে। কমও লাগতে পারে।'

'ওদের ফিরিয়ে আনুন,' বলে ওঠেন অ্যালান।

একটু চিন্তা করেন ভবতারণ। 'না, থাক। দরকার হবে না। তার মধ্যে ওদের ঘোরা শেষ হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে আজকের আয়োজনটা করা গেছে। আবার আরেকটা দিন নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'ওদের জানিয়ে দিন অন্তত।'

'কী হবে ? ভয় পেয়ে যেতে পারে। শেষের দিকে একটু তাড়াতাড়ি করলেই হবে।'

চুপ করে গেলেন অ্যালান। বৃদ্ধকে কিছু বলে লাভ নেই। একবার গোঁ ধরলে ছাড়ার পাত্র নন উনি। আর বিপদ তো কিছু নেই। ঝড়ের সময় ভ্যানের ভিতরেই থাকবে সবাই। কিছু হবে না। কিন্তু মনের খুঁতখুতানি থামাতে পারলেন না অ্যালান।

'প্রথমে লক্ষ করুন, গাছপালা। আপনাদের ডাইনে বাঁয়ে যে গাছগুলো দেখছেন তাদের নাম হল সাইক্যাড, আজকের পাম গাছের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ। এছাড়া দেখতে পাবেন গিংকো। সে যুগে অবশ্য আধুনিক কিছু গাছপালাও ছিল, যেমন পাইন, ফার এবং জলাভূমির সাইপ্রেস।

'আমাদের একটা ভুল ধারণা হলো ট্রিয়াসিক, জুরাসিক আর ক্রিটেশস যুগে উনিশ কোটি বছর ধরে কেবল বিশাল বিশাল দানব ঘুরে বেরিয়েছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে, গাছপালা খেতে খেতে আর পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে করতে। তা কিন্তু নয়। কিছু ডাইনোসর ছিল এক একটা সাধারণ বেড়ালের মতো ছোট আর বেশি ভাগ ডাইনোসর এক একটা ঘোড়ার চেয়ে বড় হত না। এখানে এদিকে ওদিকে এক ফুট লম্বা ডাইনোসর কমপসগনেথাসদের দেখতে পেলেও পেতে পারেন। তবে ওরা পার্কের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, দেখা যাবে কিনা জোর দিয়ে বলা যায় না।

'এবারে আপনাদের ডান দিকে দেখুন। যে ঘেরা জায়গাটা দেখছেন এখানে থাকে ডাইলোফসর। এরা এক ধরনের বিষ দিয়ে শিকারকে মেরে ফেলে। তারপর পিছনের পায়ে চেপে ধরে খেতে থাকে।'

সকলে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। অজস্র ঝোপঝাড়, বেশ কিছু বড় বড় গাছ। পাখির ডাক আর ঝিঁঝিঁর শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছে না। আরও ভালো করে দেখার জন্যে অজিত জানলার কাঁচ নামাবার চেষ্টা করলেন। নামানো যায় না। আটকানো আছে। ভ্যান দুটো দাঁড়িয়ে রইল মিনিট পাঁচেক। কিন্তু কোথায় ডাইলোফসর। সব ভোঁ ভাঁ। বিরক্ত হয়ে আবার ঠিক মতো যে যার আসনে বসে পড়লেন সবাই।

ভ্যান আবার সচল হল। মোলায়েম অথচ ভারি, রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর আবার বলতে শুরু করল, 'এখান থেকে বেশ খানিকটা পথ বাঁদিকে দেখবেন খোলা মাঠ। এখানে আমাদের তৃণভোজী ডাইনোসররা ঘুরে বেড়ায়। দূরে দেখুন, ব্র্যাকিওসরাসদের দেখতে

পাচ্ছেন। যে কোনো মুহূর্তে এক পাল গ্যালিমাইমাস ছুটে যেতে পারে।'

সকলের উৎসাহ আবার সজাগ হল। কিন্তু কোথায় কি! ফাঁকা মাঠ ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। বিকেল হয়ে আসছে। মাঠের উপরে গাছের ছায়া ঢলে পড়ছে পুব মুখে। পাখির কিচিরমিচির বাড়ছে ক্রমশ। ধূ ধূ মাঠের দিকে তাকিয়ে রিতি বলে উঠল, 'ধুর, এতক্ষণে একটা ইঁদুরও দেখা গেল না, বলে টিরানোসরাস দেখাবে।'

'দাঁড়া না, দিদি,' দীপ বলে, 'ব্যস্ত হচ্ছিস কেন।'

তাদের কথা পরিষ্কার শোনা যায় পিছনের ভ্যানে। বোঝা যায় দুটো ভ্যানের মধ্যে বেতারে যোগাযোগ আছে। রাকেশ বলে ওঠেন, 'আরে ডাইনোসররা কি পোষা কুকুর নাকি যে পার্ক কর্তৃপক্ষের বাঁধা সময়ের মধ্যে দর্শকদের সামনে হাজিরা দেবে। ওদের ইচ্ছে মতো ওরা আসে যায়। জ্যান্ত প্রাণীদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা চলে না। ওদের নিজস্ব অভ্যাস অনুযায়ী চলে ওরা।'

সামনের ভ্যান থেকে রাকেশের কথা শুনে' চার্লস বলে ওঠেন, 'ওসব বুঝি না, ভবতারণকে পেলে একপ্রস্থ গাল দিয়ে নিতাম।'

সকলকে চমকে দিয়ে ভবতারণের কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, 'কী গাল দিতে হে? এই তো আমি। মিঃ পান্ডে ঠিকই বলেছেন। আমার ডাইনোসরদের নিজস্ব মন আছে। তারা কি আর বললেই আসবে! তবে ভেবো না, চার্লি, একটু ধৈর্য ধর। সব দেখতে পাবে।'

আবার ধারাবিবরণী শুরু হয়। 'এক একটা ঘোড়ার মতোই বড় হত হিপসিলোফেডন্টরা। ওরা ছিল জুরাসিক যুগের হরিণ। ইংল্যান্ড থেকে মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকা, সর্বত্র ছিল এদের গতিবিধি। এরা—'

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল বক্তৃতা। আবার শোনা গেল ভবতারণের গলা। 'কথাগুলো বন্ধ করে দিলাম, অধ্যাপক বোস। এরপরে যে সমস্ত ডাইনোসরদের কথা বলা হয়েছে তারা এখনও পার্কে নেই। ঝামেলা মিটলে, পার্ক পুরোদমে চালু হলে ওদের সকলকে দেখা যাবে। অনেক কিছুই তো এখনও শুরু করতে পারিনি। যেমন টেরোডাকটিল পক্ষীশালা, যেমন ভেলোসিরাপটরদের শিকারের

মাঠ। আর সব চেয়ে আকর্ষণীয় জিনিসটা তো এখনও বানানোই শুরু হয়নি। টিরানোসরাসদের বাসস্থানের পাশে আছে একটা উঁচু টিলা। তার উপরে তৈরি করব একটা রেস্তরাঁ। সেখানে বসে পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য চাখতে চাখতে দর্শকরা দেখবে কী ভাবে শিকার ধরে দানো গিরগিটি, সরীসৃপ সম্রাট।'

রায়ার গা গুলিয়ে ওঠে। টিরানোসরাসের শিকার ছিঁড়ে খাওয়া দেখতে দেখতে পান ভোজন। লোকটার কি ঘেন্নাপিত্তি কিছু নেই!

'মিসেস বোস, এবারে আপনার ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হোন। আমরা এবার সোজা যাচ্ছি ডাইনোসর পার্কের সবচেয়ে বড় আকর্ষণের দিকে।'

দীপ আর রিতি আহ্লাদে চেঁচিয়ে ওঠে। চার্লসের মুখে ফুটে ওঠে একটু ভয়ের ছায়া। কাঁচ ঠুকে দেখেন যথেষ্ট শক্ত কিনা। মনে মনে ভাবেন, ক্লোজড সার্কিট টিভিতে দেখলেই হতো সব। অজিত নড়েচড়ে বসেন। রাকেশও একটু চনমনে হন। রায়া ক্যামেরা দেখে নেন চট করে। ঠিকই আছে সব। ভ্যান দুটো এগোতে থাকে।

'কাজটা বোধহয় ভালো হচ্ছে না,' ন্যাট বলেন। 'ঝড়ের মধ্যে ওদের পার্কে বসে থাকতে হলে কী না কী মুশকিল হবে কে জানে!'

'বসে থাকতে হবে কেন? তাড়াতাড়ি ভ্যান দুটো বার করে আনলেই হবে। তাছাড়া, এখনও তো ঘন্টাখানেক সময় হাতে আছে।'

কথাটা শুনে মনে মনে উল্লসিত বোধ করে সুবোধ। ঝড়বৃষ্টি হলে তারই সুবিধা। একটা জিপ নিয়ে পালাতে পারা যাবে সকলের অলক্ষ্যে। তার সব কিছু তৈরি। কমপিউটারকে সব নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে। অন্যদিকে ব্যস্ত ন্যাট উইভার এদিকে মন দেবার সুযোগ পাচ্ছে না। শেষ বোতামটা টেপা বাকি কেবল। তারপর কমপিউটার মিনিট পাঁচেক সময় নেবে কাজ শেষ করতে। তবে এখনও সময় হয়নি। ডানকানের মোটর বোট নিয়ে লোক আসবে

আরও ঘন্টা দেড়েক পরে। অন্ধকার হলে তবেই আসবে। সুবোধ দিনের চতুর্দশ বিয়ারের টিনের ঢাকনা খোলে। শব্দটা শুনে বিরক্ত হয়ে তাকান তার দিকে অ্যালান আর ভবতারণ। ভাবেন, লোকটার পেটে কি জায়গার কোনো অন্ত নেই!

ভ্যান দুটো চলেছে। গতি একটু বেড়েছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের বাদামি আলোয় চারদিকটা এখনও উজ্জ্বল। রাস্তাটা একটু ডান দিকে ঘুরে আবার সোজা হল। একটা ঘেরা জায়গার পাশে এসে খানিক চলে দাঁড়িয়ে গেল ভ্যান। আবার সরব হল ধারাবিবরণী।

'এখন আমরা এসে দাঁড়িয়েছি টিরানোসরাসের ডেরার পাশে। লক্ষ করুন এখানে তারের বেড়া অন্যান্য জায়গার চেয়ে অনেক বেশি উঁচু। তার ওপাশে আছে দশ ফুট চওড়া গভীর গড়খাই। তার পরে টিরানোসরাসের এলাকা। মাংসাশী ডাইনোসরদের মধ্যে বৃহত্তম সরীসৃপ। হিংস্রতায় কেবল ভেলোসিব্যাপটররা এর সমকক্ষ। দাঁড়ালে উনিশ ফুট উঁচু কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ফুট দীর্ঘ, আট টন ওজনের এই ডাইনোসর জুরাসিক যুগ থেকে ক্রিটেশস পর্যন্ত বিভীষিকার সঞ্চার করেছে তার শিকারদের মনে। তাকিয়ে দেখুন, কী ঘটতে চলেছে।'

সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে রইলেন। বেড়ার ওপাশে উঁচু গাছপালা আর ঝোপের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল একটা ছোট্ট পাটাতন। তার উপরে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা একটা বড়সড় ছাগল দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে ছাগলটা, জানেও না কী আছে তার কপালে। ফিস ফিস করে রিতি জিজ্ঞাসা করে, 'ওকে কি টি-রেকস্ খাবে এখন?'

'হ্যাঁ, মনে হয়।' চার্লসের গলা কাঁপছে। হায় ভগবান, কী কুক্ষণে ভবতারণের কথায় সায় দিয়ে যে এখানে এসেছিলাম! যদি বেড়া টপকে এদিকে চলে আসে ওই হতচ্ছাড়া টি-রেকস্!

এক মিনিট। দু'মিনিট। তিন মিনিট। আসছে না টিরানোসরাস। পাঁচ মিনিট। ছ'মিনিট। সাত মিনিট। দূরে একটা গাছের ডালে শব্দ হয়। ওই আসছে বোধ হয়। কই, না তো! দশ মিনিট।

এগারো মিনিট। বারো মিনিট। ক্রমশ সকলের টানটান স্নায়ুগুলো শিথিল হতে থাকে। দুত্তোর, কোথায় কী? আবার চলতে শুরু করল ভ্যান দুটো।

অধৈর্য হয়ে উঠছেন সবাই। সেই তখন থেকে শোনা যাচ্ছে ডাইনোসর, ডাইনোসর। দেখা গেল না এখনও একটাও। পাখি ছাড়া কোনো প্রাণীর ডাক পর্যন্ত শোনা গেল না এখনও। রাকেশ ঠাট্টা করেন, 'ওই ঝিঁঝিঁগুলোই আসলে টি-রেকস্‌টাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'বসে বসে পা ধরে গেল,' অজিত বলেন। 'চল, রায়া, একটু হেঁটে আসি। দেখা যাক, ওই মাঠের দিকটায় কী আছে।'

অজিতের পিছন পিছন সকলে নেমে পড়েন চলন্ত গাড়ি থেকে। দরজা খুলতেই ভবতারণের গলা শোনা যায়, 'নামবেন না, নামবেন না। নামা বারণ।'

কে শোনে কার কথা। রাকেশ লক্ষ করেন, একটা টিভি ক্যামেরা তাঁদের লক্ষ করছে। কাছে মাথা এগিয়ে জিভ ভেঙচে বিদ্রুপ করেন রাকেশ। ভবতারণের কথায় কান না দিয়ে সকলে মাঠে নামেন।

'আমি আগেই বলেছিলাম', অ্যালান বলেন, 'দরজাগুলো ভেতর থেকে খোলার উপায় না রাখতে। বুঝুন এখন।'

মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে চললেন অজিত। বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে। এতদিন খোলা ময়দানে খুঁজে বেরিয়েছেন কোটি কোটি বছর আগে মৃত ডাইনোসর। আজ এই সোনালী বিকেলে শুকনো ঘাস আর কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলেছেন জীবিত অথচ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর সন্ধানে।

পিছনে আসছেন রায়া, দীপ, রিতি আর রাকেশ। সবার পিছনে চার্লস। পুরো ব্যাপারটা তাঁর একটুও পছন্দ হচ্ছে না। কোন্‌ দিক থেকে কোন বিভীষিকা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কে জানে। অনেকবার সকলকে অনুরোধ করেছেন ভ্যানে ফিরতে। কেউ তাঁর কথা শোনেনি। একা বসে থাকা অসম্ভব। তায় আবার টি-রেকসের ধারে কাছে! হঠাৎ অজিতের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল চার্লসের। 'দাঁড়াও সবাই। সামনে কিছু একটা

জানোয়ার রয়েছে।'

সকলে দাঁড়িয়ে গেল। অজিত পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। রায়া হাত বাড়িয়ে আটকে দেওয়ার আগেই দীপ ছুটল অজিতের পিছনে। সামনের উঁচু ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হলেন অজিত আর দীপ।

রিতি মুঠো করে ধরে আছে রায়ার হাত। রাকেশের প্রায় দম বন্ধ। শোনা গেল অজিতের হাসিতে ভরা কথা, 'এসো সবাই, দেখে যাও। কী বিচিত্র প্রাণী!'

হিংস্র ক্ষুধা

'আর মিনিট পয়তাল্লিশেক', ন্যাট বলেন, 'তারপরেই ঝড়টা শুরু হবে।'

স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কী দ্রুত এগোচ্ছে ঝড়ের মেঘ। আকাশের কোণে ইতিমধ্যেই মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়ে গেছে।

'এবারে ওদের ফিরিয়ে আনুন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছি না, কিন্তু এই তো প্রথম ডাইনোসর পার্কের ভেতরে নতুন লোক ঢুকেছে, অনেকগুলো অজানা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এই ঝড়টার ফলে, কাজেই ঠিক কোনদিকে ঘটনা যাবে বলা যায় না। ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। কাল সকালে নাহয় চটপট আরেকবার ঘুরিয়ে আনবেন সবাইকে।'

ওদিকে সুবোধের সব কাজ শেষ। এবারে সময় হলেই হয়। শুধু চিন্তার কথা একটাই। ঝড় যদি বেশি জোর হয়, তাহলে ডানকানের সাঙ্গপাঙ্গরা অপেক্ষা করতে পারবে তো তার জন্যে? অবশ্য দায়টা ওদেরই, তাছাড়া মালকড়ি যা পাচ্ছে ওরা তার বদলে এটুকু বিপদের মুখোমুখি হতে হবে বৈকি!

এক ছুটে ঝোপটা পেরোলেন রায়া। রিতি তাঁর পিছনে। তার পরে আসছেন রাকেশ আর চার্লস। যে দৃশ্যটা দৃষ্টিগোচর হল সেটা সত্যিই মজাদার।

ডান দিকে কাত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে একটা অদ্ভুত দর্শন প্রাণী। মুখটা ঠিক গণ্ডারের মতো, টিয়াপাখির মতো ঠোঁট, নাকের ডগায় শিংটা বড় নয়, কিন্তু দু'চোখের উপরে দুটো বাঁকানো শিং পাঁচ ফুট লম্বা। গায়ের রং ও আকৃতি দুই-ই হাতির মতো। মাথার ঠিক পিছনে হাত পাখার মতো গোলাকার চ্যাটালো একটা চুড়ো ঘাড় ঘিরে আছে।

বিশাল জীবটা এখন অসহায়ের মতো মাটিতে শুয়ে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল পিপেসদৃশ পেটটা ওঠানামা করছে। চোখ খোলা। আধ খোলা মুখের পাশ দিয়ে মোটা জিভ খানিকটা বেরিয়ে আছে।

দীপ লাফাতে লাফাতে আবদার করছে পিঠে চড়বে বলে। পাশে সহাস্যবদন এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই একটা শিং ধরে তর তর করে গা বেয়ে পিঠের উপর চড়ে বসল দীপ।

অজিত বললেন, 'ট্রাইসেরাটপস।' রায়া হতবাক। ডাইনোসর পার্ক তাঁকে একদম স্তব্ধ করে দিয়েছে। এসব প্রাণী এখানে সশরীরে বর্তমান, একথা জানা থাকলেও, চাক্ষুস তাদের দেখলে বারে বারে চমকে উঠতেই হয়। প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে রায়া এবার ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হলেন।

যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি ডাইনোসর পার্কের পশু চিকিৎসক। নাম অনিরুদ্ধ কর। ট্রাইসেরাটপস শুয়ে কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'একে নিয়ে আমাদের একটা সমস্যা যাচ্ছে। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছে।'

'কী হচ্ছে?' অজিত জানতে চান।

'এত বড় দেহের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এলোমেলো হাঁটছে আর প্রচণ্ড পেট খারাপে ভুগছে। প্রতি ছ'সপ্তাহে একবার এমন হচ্ছে।'

'রায়া, দেখ এসে, এর জিভটা কেমন হয়ে আছে,' অজিত বলেন।

ক্যামেরা নামিয়ে রায়া এসে বসেন টপসের মাথার পাশে।

কুতকুতে একটা চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভটার উপরে ছোট ছোট ফোসকা। নখ দিয়ে খোঁচা দিতেই ফোসকা থেকে সাদা একটা তরল বেরিয়ে আসে। রিতি নাক কুঁচকে বলে, 'ওয়াক থুঃ!'

'এ কি সারাক্ষণ খায়?' রায়া জিজ্ঞাসা করেন।

'তাছাড়া কী! এত বিশাল একটা দেহ, তাকে বাঁচতে হলে দিনে অন্তত আড়াইশো তিনশো কিলো ঘাসপাতা খেতেই হয়। সব সময়েই খাচ্ছে।'

'তাহলে কোনো বিষাক্ত গাছপাতা খেয়ে অসুস্থ হচ্ছে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে সব সময়েই ভুগতো।'

'বিষাক্ত শাকপাতা ওরা চেনে। নিজে থেকেই খায় না।'

রায়া ডাঃ করের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে টপসের চোখটা দেখেন। 'ও যে শুয়ে আছে এখানে সে কি আপনার ঘুমপাড়ানি বন্দুকের গুলির প্রভাবে?'

'হ্যাঁ। চোখের তারা কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে দেখুন।'

'কিন্তু এর চোখের তারা তো বড় হয়ে আছে।'

'তাই তো!' ডাঃ কর আশ্চর্য হন। 'তাহলে কোনো বিষক্রিয়াই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'কতটা জায়গা জুড়ে ও ঘুরে বেড়ায়?'

'এই ধরুন পাঁচ বর্গ মাইল।'

'এই আশেপাশেই?'

'হ্যাঁ। আর অসুস্থ হয় মোটামুটি এই মাঠে ঘুরতে ঘুরতেই।'

এদিক ওদিক তাকালেন রায়া। একটু দূরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই নিচু ঝোপগুলো দেখছেন? বেশ সুন্দর দেখতে? এ গাছগুলোও কি আপনারাই আমদানি করেছেন?'

'হ্যাঁ, আমরাই এনেছি। ওগুলো ওয়েস্ট ইনডিয়ান লাইল্যাক। বিষাক্ত। পশুরাও বোঝে। মুখেও দেয় না।'

'ঠিক জানেন?'

'আমরা সব সময়ই ভিডিওতে খেয়াল রাখি। খায় না ওরা।'

'কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখছি টপসের শরীরে বিষক্রিয়ার ছাপ রয়েছে। শরীরের অসাড়তা, ভীষণ পেট খারাপ হওয়া, চোখের তারা বড় হয়ে যাওয়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ফোসকা পড়া, সবই আছে।' বলতে

বলতে বলতে ঝোপগুলোর কাছে চলে এসেছেন রায়া। 'কিন্তু ঝোপগুলো তো আস্তই রয়েছে। খায়নি দেখছি।'

সকলে রহস্যের সমাধান জানার জন্যে রায়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'আচ্ছা, টপসের গোবর মানে, ওর মল, পরীক্ষা করতে পারলে কি কিছু বোঝা যেতে পারে না?' নিজের মনেই বলেন রায়া।

'দেখুন না পরীক্ষা করে। ওই পাশে গেলেই প্রচুর গোবর দেখতে পাবেন। পেট খারাপে ভুগছে বেচারা।'

এতক্ষণ যেগুলোকে সকলে উইঢিপি মনে করছিলেন সেগুলোই দেখা গেল টপসের গোবরের স্তূপ। ডাঃ করের কাছ থেকে নেওয়া পলিথিনের দস্তানায় কনুই পর্যন্ত ঢেকে গোবর নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন রায়া। কিছু পেলেন না।

রাকেশ বলে উঠলেন, 'কিছু খাওয়ার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে নেবেন কিন্তু ভাবী।' দস্তানা খুলতে খুলতে হেসে ফেললেন রায়া। কিন্তু সমস্যা তো থেকেই গেল। হঠাৎ অজিত বললেন, 'দেখো তো রায়া এই পাথরগুলো।'

মাঠের মধ্যে পাথর ছড়িয়ে আছে নানা আকারের। তার মধ্যে কতগুলো ঠিক মার্বেলের মতো গোলাকার, ঠিক যেন ঘষা লেগে লেগে অমন হয়েছে। পড়ে রয়েছে ছোট ছোট স্তূপ হয়ে, কেউ যেন ফেলে গেছে।

'এগুলো মনে হচ্ছে আমার চেনা,' অজিত বলেন। 'কিছু জীব, যেমন কোনো কোনো পাখি, কুমির, ছোট ছোট পাথর গিলে খাদ্যনালীর মধ্যে একটা থলিতে রেখে দেয়। শক্ত মাংস, শক্ত পাতা বা গাছের ডাল, তাদের গলা দিয়ে নামার সময় ওই পাথরগুলোর মধ্যে দিয়ে যায়। মাংসপেশির চাপে পাথরগুলো একটা অন্যটার সঙ্গে ঘষটাতে থাকে। সেই চাপে পিষ্ট হয়ে নরম হয়ে পাকস্থলিতে ঢোকে। ফলে হজম হতে সুবিধে হয়। কিছুদিন পরে পরে, যখন ওগুলো খুব মসৃণ হয়ে যায়, পাথরগুলোকে ওই প্রাণীরা ত্যাগ করে। আবার নতুন পাথর গিলে নেয়।'

'বুঝলাম,' রাকেশ বলেন, 'কিন্তু এখানে একথা উঠছে কেন?'

'আমরা অনেকদিনই সন্দেহ করছিলাম যে ডাইনোসররা এরকম পাথর খায়। ডাইনোসরদের দাঁত দেখে মনে হচ্ছিল না যে শক্ত

শক্ত ঘাসপাতা তারা চিবিয়ে খেতে পারে। কিছু কঙ্কালের পেটের জায়গায় পাথরের স্তূপও পাওয়া গেছে। তাই দেখে জীবাশ্মবিদদের মনেই হচ্ছিল ডাইনোসররা খাবার না চিবিয়েই গিলে ফেলতো আর হজম করতো এই রকম পাথরের সহায়তায়। তা এখন মনে হচ্ছে আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল।'

'এতক্ষণে বুঝলাম,' রায়া বললেন, 'টপস মসৃণ হয়ে যাওয়া পাথর ত্যাগ করে যখন নতুন পাথর খেতে যায় তখন তার সঙ্গে ওয়েস্ট ইনডিয়ান লাইল্যাকের কুলের মতো ফল গিলে ফেলে আর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঝোপটা খায় না, কিন্তু পাথরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা কুলগুলোকে বিষাক্ত বলে বুঝতে পারে না।'

কথায় কথায় সবাই এত মশগুল ছিলেন যে লক্ষই করেননি আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। চার্লস বারে বারে বলছিলেন গাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা, আর ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিলেন চারদিকে। কে জানে কোন দানব এসে উপস্থিত হবে হঠাৎ। শুয়ে থাকলেও ওই ট্রাইসেরাটপসকে তাঁর মোটেই সুবিধের জীব মনে হচ্ছিল না। এখন আচমকা কড় কড় কড়াৎ করে মেঘ ডেকে উঠতেই ভীষণ চমকে উঠলেন তিনি। বলে উঠলেন, 'এখনও যাবেন না? কী বৃষ্টি আসছে দেখেছেন?'

সকলেরই এবার খেয়াল হল। ততক্ষণে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ো হাওয়ায় গাছপালা ছটফট করতে আরম্ভ করেছে। রায়া বললেন, 'তোমরা চলে যাও গাড়িতে। আমি একটু ডাঃ করকে সাহায্য করি। ওঁর জীপে ফিরে যাবো আমি।'

একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। অস্তগামী সূর্যও মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। সকলে ফিরে চললেন গাড়ির দিকে।

সুবোধ প্রামাণিক এবারে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মনিটরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র রীতিমতো বিক্ষুব্ধ। প্রধান ডকের জাহাজঘাট খোলা সমুদ্রের উদ্দামতা থেকে অনেকটাই সুরক্ষিত। সেখানেও বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। তুলনায় পুবের জাহাজঘাট বেশ ন্যাড়া। সেখানে ঢেউ-এর মাতামাতি ভীতিপ্রদ চেহারা নিয়েছে।

তাড়াতাড়ি না গেলে ডানকানের লোকজনকে আর ধরা যাবে না।

ভবতারণ আর ন্যাট গাড়িদুটোর ফিরতি পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটা ক্যামেরার আওতা থেকে অন্যটার আওতায় যাওয়ার মাঝের সামান্য ফাঁকটুকু পেরোতে গাড়ি দুটোর যেন অনন্ত কাল লাগছে। ভবতারণ বললেন, 'এর চেয়ে জোরে আর গাড়ি চলবে না, না?'

'না।' ন্যাটের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'চুপ করুন,' অ্যালান বলেন, 'এক্ষুনি ওরা ফিরে পৌঁছবে টিরানোসরাসের এলাকার মধ্যে।'

এই সুযোগ। সুবোধ উঠে দাঁড়ায়। কমপিউটারে 'একজিকিউট' নির্দেশ দেওয়ার অপেক্ষা কেবল। গলা খাঁখারি দিয়ে সুবোধ বলে, 'ইয়ে, মানে, আমি একটু পেচ্ছাপ করে আসবো?'

ভবতাবণের অসহ্য লাগে এ ধরনের বিশ্রি ভাষা। ন্যাট হাত নেড়ে বলেন, যাও।

অ্যালান একটু সন্দেহের চোখে তাকান। লোকটার হাবভাব যেন কেমন অন্য রকম লাগছে। তারপবেই মনে হয়, অবশ্য সারা দিন টিন টিন বিয়ার খেলে প্রকৃতির ডাক বেশ চাপসৃষ্টি করবেই। তাই লোকটাকে ওরকম লাগছে।

'শুনুন, ন্যাট', সুবোধ বলে, 'কমপিউটাবের গোলমালগুলো সবই প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। কাজ চালু করে দিয়েছি। ফোনগুলোও ঠিক হয়ে যাবে এবার। তবে.....হ্যাঁ, ওই দু'একটা এলাকায় অল্প সময়ের জন্যে কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফোন বা বেতাব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে চিন্তার কিছু নেই। হলেও হবে পনেরো কুড়ি মিনিটের জন্যে। তারপরে ওই এলাকা থেকে খানিকটা শক্তি টেনে নিয়ে কমপিউটার নিজেই নিজেকে শুধরে নেবে। ক্লোজড সার্কিট মনিটরগুলো বন্ধ হলে ভাববেন না। এক্ষুনি আসছি আমি।'

হাঁসের মতো দুলতে দুলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুবোধ। তাব আগে, টেবিল থেকে সরে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে বোতাম টিপে কমপিউটারকে নির্দেশ দিয়েছে সুবোধ প্রামাণিক—সমস্ত ভিডিও অডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দাও, সমস্ত মনিটরগুলো অকেজো করে দাও, সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা তুলে নাও, সব ক'টা

বেড়ায় বিদ্যুৎ প্রবাহ থামিয়ে দাও। কমপিউটার প্রাণহীন, বিচারবুদ্ধিহীন। নতুন প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে শুরু করল নির্দেশ পালন করতে। মূল এবং প্রধান প্রোগ্রামে হাত পড়বে না, কিন্তু সাময়িকভাবে কমপিউটার গোটা ডাইনোসর পার্ককে ফেলে দেবে চরম অসহায়তার কবলে।

গাড়ি ফিরে চলেছে। সামনের গাড়িতে চার্লস রিতি আর দীপের সঙ্গে কথা না বলে এক মনে জানলার কাঁচে বৃষ্টির জলের ধারাগুলোকে খুব মন দিয়ে দেখছিলেন। মাঝে মাঝে রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি গেলে শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলছিলেন চার্লস মারিনেত্তি। সামনের আসনে চার্লসের ডান দিকে বসে এটাওটা নাড়াচাড়া করছিল দীপ। পিছনে রিতি বসেছিল বিরক্ত মুখে। দাদু যে কী বলে তার ঠিক নেই! একটা মাত্র ডাইনোসর দেখা গেল, তায় আবার অসুস্থ। দূর ছাই। দিনটাই মাটি।

দ্বিতীয় গাড়িতে পাশাপাশি বসে রাকেশ আর অজিত নানা কথা আলোচনা করছিলেন। ছাতে বৃষ্টির শব্দ, চারপাশটা অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হেড লাইটের আলো বৃষ্টিধারা ভেদ করে দশ বারো ফুটের বেশি যেতেই পারছে না। সার্চলাইটগুলো জ্বালায়নি কেন কে জানে। ছাতের কাঁচ দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে না। কেবল মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে মেঘের ঘন আস্তরণ চোখে পড়ছে। গাড়ির সব কাঁচ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও একটু যেন শীত শীত করছে।

'ভালো লাগছে না,' বলেন রাকেশ। 'খিদে পায়নি আপনার?'

'পেয়েছে। তবে তেমন বেশি নয়। আমি ভাবছি বাচ্চা দুটোর কথা। চারদিক অন্ধকার, আর চার্লস তো কথাবার্তা বলার লোক নয়, ওরা ভয় পাচ্ছে কিনা কে জানে।'

'না, না। দুজনেই বেশ বিচ্ছু, ভয়টয় পাবে না। তবে—'

হঠাৎ সব আলো নিভে গেল। গাড়ি থেমে গেল একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে। অজিত বলে উঠলেন, 'কী হল রে বাবা! হাতটাত দিইনি তো কিছুতে!'

'যা ঝড় হচ্ছে, বিগড়েছে কিছু বোধহয়।'

'নাও ঠেলা। থাকো বসে এখন। কতক্ষণে ঠিক হবে গাড়ি কে জানে।'

চার্লসও ঠিক সেই সিদ্ধান্তেই এসেছেন। দীপ বলে, 'দিদি, বেশ মজা না? এখন যদি টিরানোসরাস আসে? ভয় পাবি তো?'

'চুপ কর বাঁদর। পেট চুঁই চুঁই করছে খিদেয়। তুই এখন আর টিরানোসরাসের নাম করিস না।'

কী আর করা! সকলেই অগত্যা চুপ করে বসে রইলো কতক্ষণে আবার গাড়ি চালু হবে তার অপেক্ষায়। কেউ লক্ষও করল না, গাড়ি দুটো দাঁড়িয়ে আছে টিরানোসরাসের বাসস্থানের পাশে।

সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি করে নামল সুবোধ প্রামাণিক। ডানদিকে ঝুল বারান্দার শেষে ডিকনটামিনেশন চেম্বারের ভিতর দিয়ে এমব্রায়ো রুম। এখানে দশ ডিগ্রি শীতলতায় বিভিন্ন ডাইনোসর-ভ্রূণগুলো হিম ঘরে রাখা আছে।

ঘরে এখন কেউ নেই। যে দু'জন কর্মী থাকে সাধারণত তারা এই সময়টায় নৈশ আহারের জন্য চলে যায়। দরজাগুলো স্বচ্ছন্দে হাতের ঠেলায় খোলা যাচ্ছে। সুরক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে কমপিউটার।

ঘরের মাঝখানে কয়েকটা আলমারি, পোস্ট বক্সের মতো গোল। তার দুটোর মাথায় হাতল ধরে টানতেই বয়ামের মতো আধার উঠে বেরিয়ে এল। গা থেকে তরল নাইট্রোজেন বাষ্পীভূত হয়ে ধোঁয়ার মতো উবে যাচ্ছে। বয়ামের গায়ে তাকের মধ্যে সাজানো রয়েছে সারি সারি টেস্ট টিউব। প্রত্যেকটার গায়ে লেখা রয়েছে ভ্রূণের প্রজাতির নাম। ট্রাইসেরাটপস, টিরানোসরাস, ভেলোসির‍্যাপটর, অ্যাপাটোসরাস, হ্যাড্রোসরাস, স্টেগোসরাস, কমপসগনেথাস। আরও অনেক।

কাঁধ-ব্যাগ থেকে শেভিং ক্রিমের কৌটোটা বের করে সুবোধ। প্যাঁচ ঘোরাতেই তাকগুলো দেখা যায়। তাড়াতাড়ি যতগুলো পারে টিউব নিয়ে ভরে ফেলে সে। কৌটোটা আবার বন্ধ করে তলায়

একটা বিশেষ জায়গায় চাপ দিতেই হিস হিস শব্দে কৌটোর মধ্যে ঠাণ্ডা রাখার উপযোগী কোনো গ্যাস বেরিয়ে আসে। ডানকান বলেই দিয়েছিল, যে পরিমাণ গ্যাস আছে তাতে ছত্রিশ ঘন্টা প্রয়োজনীয় হিমাঙ্ক বজায় থাকবে কৌটোর মধ্যে। ততক্ষণে তো জাহাজে উঠে ঠিক মতো ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ব্যাগে কৌটোটা ভরে ফেলে সুবোধ প্রামাণিক বাইরে বেরিয়ে আসে। চারদিকে কোথাও কেউ নেই। একটু হেঁটেই ভূগর্ভস্থ গ্যারেজ। সারি সারি টয়োটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশে একটা পেট্রোলে চলা জিপ। উঠে পড়ে সুবোধ। বিদায় চক্কোত্তি। একটু পরেই এখানে ধুন্ধুমার কান্ড শুরু হবে। তার আগেই আমি পগাড় পার। আমার চুরির কোনো প্রমাণও থাকবে না। কী আনন্দ!

‘এ কী ব্যাপার?’ ন্যাট বলে ওঠেন, ‘সুবোধ সীমানার বেড়াগুলোর বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিল কেন?’

‘কোথায়, দেখি?’ ভবতারণ ঝুঁকে পড়ে সামনের মনিটরটার দিকে তাকান। সত্যিই তো! গোটা পার্ক জুড়ে সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাচ্ছে। ভ্যান দুটো থেমে গেছে নিশ্চয়। ভিডিও মনিটর বিকল। দেখা যাচ্ছে না। এখন কমপিউটার মনিটরে দেখা যাচ্ছে, দপ দপ করতে করতে একটার পর একটা বেড়া থেকে অপসারিত হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ।

‘কী হবে এখন?’ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করেন বায়া। প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে তিনি মিনিট পাঁচেক আগে কনট্রোল রুমে এসে ঢুকেছেন।

‘হয়তো কিছুই হবে না। এমনিতে ডাইনোসরগুলো কখনই প্রায় বেড়ার ধারে কাছে আসে না। সুবোধ বলে গেছে, মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার সব কিছু চালু হয়ে যাবে। তার ভিতরে আশা করি কিছু হবে না। তবে বলা যায় না।’

ভবতারণের মুখ শুকনো। ডাইনোসর পার্কে আজ প্রথম অতিথি এসেছে। আজই এসব ঝামেলা. এই সুবোধ প্রামাণিককে দিয়ে আর চলবে না। ওকে এবার বিদায় করতেই হবে। এত বড় ব্যবসায়িক সাফল্যের মুখে এসে পড়েও যদি সব বানচাল হয়ে

যায় তাহলে তা খুবই দুঃখের কথা হবে। তাছাড়া নাতি-নাতনি দুটোও ওই অন্ধকারে বসে আছে। ওদের কিছু হবে না তো!

অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রা এসেছিল চার্লসের। ঝাঁকুনি লাগাতে চোখ খুললেন তিনি। হঠাৎ তাঁর চোখ যায় একপাশে রাখা জলের বোতলের দিকে। কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে জলটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি পায়ের শব্দে মাটি কেঁপে ওঠে। গাড়িটাও।

ডানদিকের জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় রিতি। একে অন্ধকার, তায় বৃষ্টি পড়ছে। সব ঝাপসা। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই হতচকিত রিতি দেখে, সেই পাটাতনটার উপরে ছাগলটা নেই। ছেঁড়া দড়িটা দুলছে বৃষ্টির তোড়ে। 'একি? ছাগলটা কোথায় গেল?'

হঠাৎ ধপ করে কী যেন এসে পড়ে গাড়ির ছাদে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে রিতি দেখে ছাগলটার একটা পা, কোমরের কাছ থেকে ছেঁড়া, রক্ত বেরোচ্ছে, এসে পড়েছে কাঁচের উপর। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে রিতি। তিনজনেরই চোখ যায় বাইরে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে বাইরে তাকায় সবাই। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু তারগুলো আর সতর্কবাণী লেখা কাঠের তক্তাটা। চোখ তোলে সবাই আরও উপর দিকে। তারের একেবারে উপরে যা তারা দেখে তাতে সকলেরই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

জ্যান্ত বিভীষিকা। টিরানোসরাসের বিরাট মাথা গলা উঁচু করে গিলে ফেলছে কিছু। নিশ্চয় ছাগলটার দেহ। এত দূর থেকেও অনুভব করা যাচ্ছে, কী সাংঘাতিক হিংস্র ক্ষুধায় সেই দানব গোটা ছাগলটাকে গিলে ফেলছে।

দীপ দেখে, টিরানোসরাসের কস বেয়ে রক্ত পড়ছে। তার চোখটা রাস্তায় তাদের ভ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে একটা হাত এগিয়ে আসে। একটানে ছিঁড়ে ফেলে বেড়ার তার। এ জায়গাটা বেশি উঁচু। ভয়ানক জানোয়ারটা একটা গর্জন করে ছুটে যায় গাড়ি দুটোর পিছনের দিকে। ওদিকে বোধহয় উপরে উঠে আসার পথ আছে কোনো।

গাড়ির মধ্যে বসে কাঁপতে থাকে দুটি শিশু। আতঙ্কিত চার্লস অনুভব করেন, তাঁর প্যান্ট ভিজে গেছে। যমদূত আসছে।

আর পারলেন না চার্লস। এক টানে দরজা খুলে ফেলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গেলেন পিছন দিকে। কাঠের একটা ঘর রয়েছে। তারই মধ্যে ঢুকে পড়লেন চার্লস মারিনেত্তি। একবারও ভাবলেন না দুটো বাচ্চা পরে রইল অন্ধকারে।

বিষের কামড়

জিপটা এসে দাঁড়াল ডাইনোসর পার্কে ঢোকার প্রধান ফটকের মুখে। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। একটা হলদে বর্ষাতি গায়ে চড়িয়ে জিপ থেকে নেমে সুবোধ প্রামাণিক কোনো রকমে ছুটে গেল দরজার একপাশে লাগানো বাকসটার দিকে। পাল্লাটা খুলে ভিতরের হাতলটা পুরো ঘুরিয়ে দিল সুবোধ। নিঃশব্দে খুলে গেল ফটক। আবার গাড়ি চললো। পার্কের ভিতরে চলে এসেছে সে। এবারে রাস্তা সাফ।

বৃষ্টির চোটে কিছু দেখা যাচ্ছে না। জলের ছাটে চশমা ঝাপসা। দুপাশে ঘন জঙ্গল। হেড লাইটের আলো অন্ধকার যেন আরও বাড়িয়ে তুলছে। শোনা যাচ্ছে কেবল বৃষ্টির আওয়াজ আর ভিজে রাস্তায় চাকার সরসর শব্দ। জলের ছাঁট এসে চোখ বন্ধ করে দিতে চাইছে। ঘড়ি দেখে সুবোধ। পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দরকার জাহাজ ঘাটে। জিপের গতি সে আরও বাড়ায়। ভিজে রাস্তায় চাকা পিছলে যেতে পারে জেনেও। উপায় কী নাহলে!

রাস্তাটা অপ্রশস্ত। শুধু তাই নয়, রাস্তাটা আবার কাঁচাও। কেবল খোয়া ফেলা। লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে জিপ। সামনে কোথাও

একটা বাঁক আছে। সেখানে একটা পথ দেখানো চিহ্ন থাকার কথা। এমনিতে তো পথ ঘাট ভালো বোঝাই যাচ্ছে না। এখানকার জন্তু জানোয়ারগুলো আবার কোনো ঝামেলা না করে পথের মধ্যে। রাস্তাটাও চেনা যাচ্ছে না ঠিক মতো। খুব মুশকিল হল তো!

হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে বাধ্য হয় সুবোধ প্রামাণিক। সামনে একটা বেড়া আর দরজা। গায়ে সাবধানবাণী—দশ হাজার ভোল্ট তরিৎসঞ্চারিত বেড়া: সাবধান!

গজ গজ করতে করতে নামে সুবোধ। হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে যায়। ঢুকে পড়ে ভিতরে সুবোধ গাড়ি নিয়ে। এবার রাস্তাটা একদম কাঁচা। এখানে ওখানে জল জমে আছে। সময় নেই। আরও জোরে গাড়ি চালায় সুবোধ। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। কিন্তু বাঁকটা কোথায়?

এরকম রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ি চালালে যা হওয়ার তাই হয় এবার। আচমকা একটা গর্তে পড়ে সামনের চাকা। পিছলে যায় জিপ। ঘুরে গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার ধারে পথ-নির্দেশ চিহ্ন আঁকা কাঠের থামে। হেড লাইটের আলোয় সুবোধ দেখে, কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে পুবের জাহাজঘাট। কিন্তু দিক নির্দেশক তীর চিহ্নটা ভেঙে গিয়ে আকাশের দিকে ঘুরে গেছে। সর্বনাশ। এখন কোনদিকে যেতে হবে বোঝা যাবে কী করে?

ধুর ছাই! কী জঘন্য জায়গা রে বাবা! মনে মনে বিশ্বব্রহ্মান্ডকে গাল দিতে দিতে সুবোধ হিসেব করে, খানিক উত্তরে চলে ডান দিকে ঘুরেছি, মানে পুব দিকে। এখানে তো সোজা আর যাওয়া যাবে না, তাহলে বাঁ দিকে এগিয়ে পরে ডান দিকে আবার ফিরলেই হবে। দেখা যাক কী হয়। ফেরার তো প্রশ্ন নেই আর। যাই হোক, সাবধানের মার নেই। কাঁধব্যাগ থেকে বার করে শেভিংক্রিমের কৌটোটা নিজের জামার পকেটে ভরে রাখল সুবোধ। এবার আর পড়ে যাবার ভয় থাকল না।

চলল আবার জিপ। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। রাস্তা একই রকম খারাপ। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। সামনে আর একটা ডানহাতি রাস্তা কোথায়? বারে বারে চশমা মুছে নিতে হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার আবছা হয়ে যাচ্ছে কাঁচ।

বিপদ এল একদম হঠাৎ। চশমা মুছতে বাঁ হাত স্টিয়ারিং থেকে সরিয়েছে সুবোধ, ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার গাড়ির চাকা কাদায় পিছলে গেল। হুড়মুড় করে জিপ বাঁ দিকে ঘুরে মুখ নিচু করে ঝুঁকে পড়ল রাস্তার ধারে একটা খাদের দিকে। আটকে রইল নর্দমার ধারের বাঁধানো কালভার্টের কিনারায়। কয়েকবার গাড়ি পিছিয়ে নেবার চেষ্টা করল সুবোধ। কিন্তু লাভ হল না। কাদায় আটকে গেছে পিছনের চাকা। চালাতে গেলে কেবল ঘুরে যাচ্ছে। মাটি কামড়াতে পারছে না। কী হবে এখন?

'দেখো, সব পরীক্ষা করে দেখো, সুবোধ আরও কী করেছে, ভবতারণ বলেন। 'মতলব কী ওর?'

ন্যাট নীরবে সুবোধের কমপিউটার টারমিনালে এসে বসেন। এক ঝটকায় টেবিল থেকে ফেলে দেন বিয়ারের খালি টিন, আধ খাওয়া স্যান্ডউইচ আর অজস্র চকলেটের খোসাকাগজ। একটা একটা করে এলাকা পরীক্ষা করতে থাকেন। যে চিত্র স্পষ্ট হয় তা দেখে সকলের কপালে ঘাম দেখা দেয়। এ কী করেছে সুবোধ প্রামাণিক! সব কিছু বিকল! শুধু তাই নয়। এমন কোনো একটা সাঙ্কেতিক নির্দেশ কমপিউটারকে দিয়ে গেছে যেটা নতুন বানানো প্রোগ্রামকে পাশ কাটিয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতেই দেবে না। সেই সাঙ্কেতিক নির্দেশ ছাড়া কমপিউটারের মূল প্রোগ্রামে ফিরে গিয়ে ডাইনোসর পার্কের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আবার চালু করা যাবে না কিছুতেই।

ফোন তোলেন ভবতারণ। কোনো শব্দ নেই। পার্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

'কোনো উপায় নেই?' ভবতারণের কণ্ঠস্বরে হতাশা।

'না। সুবোধকে ছাড়া কমপিউটার ফিরে চালানো যাবে না।'

রায়ার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে যায়। তাহলে? তাহলে কী হবে? আমরা সবাই এখন তবে সেই প্রাগৈতিহাসিক প্রকৃতির হাতে অসহায় পুতুল? ভয়ানক দানবদের সামনে সেই মেসোজয়িক যুগের স্তন্যপায়ীদের মতোই অসহায়?

'একদম নড়বেন না,' অজিত বলেন, 'স্থির হয়ে বসে থাকুন। টের যেন না পায় আমরা গাড়ির ভিতরে রয়েছি।'

রাকেশের কথা বলার বা নড়ার ক্ষমতাই নেই। জানলার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে টিরানোসরাস। এত কাছে যে তার পায়ের মাংসপেশির কুঞ্চনও দেখা যাচ্ছে। ঢিপি ওঠা ওঠা পায়ের সবজেটে ধূসর চামড়া বেয়ে জল নামছে। এত কাছে যে তার পায়ের কেবল গোছটুকুই চোখে পড়ছে। শরীরের বাকিটা অনেক উপরে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আকাশ ফাটিয়ে গর্জন করে উঠল ভয়ঙ্কর জীবটা। গাড়িটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল যেন সেই শব্দে।

চার্লসকে ছুটে পালাতে দেখেছেন অজিত এবং রাকেশ। ভাবছিলেন নেমে সামনের গাড়িতে যাবেন কিনা, ঠিক সেই সময়েই মাটি কাঁপানো পদক্ষেপে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুদূত।

চার্লসের পালিয়ে যাওয়া দেখে দীপ আর রিতি এত বিস্মিত বোধ করেছে যে হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করতেও ভুলে গেছে তারা। সে অবকাশও অবশ্য মেলেনি। তার আগেই পিছনের কাঁচের মধ্যে দিয়ে তারা দেখেছে দুঃস্বপ্নের জীবন্ত চেহারা।

পিছনেই রাখা ছিল একটা বাক্স। ডালা খুলতেই হাতে পড়েছে একটা বড় টর্চ। ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে রিতি জ্বালিয়ে ফেলল টর্চটা। শক্তিশালী টর্চের আলোর রশ্মি কাঁচের মধ্যে দিয়ে এদিক ওদিক নড়তে চড়তে লাগল। সেই আলো দেখেই সচল হল টিরানোসরাস।

অজিত তখন মনে মনে বলে চলেছেন, 'নিভিয়ে দে, টর্চটা নিভিয়ে দে, বাঁচতে চাস তো আলোটা নেভা। হয়তো অন্ধকারে নাও দেখতে পেতে পারে টিরানোসরাস।' কিন্তু ততক্ষণে এগিয়ে গেছে রাক্ষস। আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে অজিত দেখলেন অতিকায় দুটো পা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। আর একটু এগোতেই বিশাল শরীরটা ক্রমশ নজরে আসতে লাগল। দুটো হাতির সমান উঁচুতে মাথা, মোটা থেকে সরু হয়ে আসা নারকেল গাছের গুঁড়ির মতো একটা লেজ, ঢালু শিরদাঁড়া। নিশ্চিত মৃত্যু।

হঠাৎই টর্চটা নিভে গেল। কী করে যেন হাতের চাপে বোতাম টেপা হয়ে গেছে। ততক্ষণে গাড়ির পাশে পৌঁছে গেছে টিরানোসরাস। কিন্তু কী হল কে জানে, থমকে দাঁড়াল দানব। কেমন যেন বিস্মিত হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে রইল ভ্যানটার দিকে। ভিতরে রিতি আর দীপ কাঠ হয়ে বসে আছে। রাক্ষসের মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। খেতেও তো আসছে না! খুব আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে খোলা দরজার পাল্লাটা টেনে ধরে বন্ধ করে নেয় দীপ। ধপ করে আওয়াজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ·'টিতি ঘাড় নামিয়ে গাড়ির দিকে তাকায় টিরানোসরাস। এবার তার মাথাটা দেখতে পায় দুই ভাইবোন। কঠিন, অসীম শক্তিশালী চোয়াল। ছুরকুটে করাতের মতো বিরাট দাঁতের সারি। প্রায় ছয় ফুট লম্বা ওই মুখ বিভৎসতম দুঃস্বপ্নেও অপরিচিত। সেই মাথা ক্রমশ এগোয় গাড়ির জানলার দিকে। কাঁচের ভিতর দিয়ে রিতি আর দীপের দিকে তাকায় একটা হিম শীতল সরীসৃপ-চোখ। মণিটা ঘোরে, চারপাশের চামড়া কুঁচকে যায়। ভয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ির অন্যপাশে সরে যায় দুই অসহায় বালক-বালিকা। মুখটা ঘুরে এবার তাকায় সামনের কাঁচের মধ্যে দিয়ে। তারপরেই বিকট গর্জন শুনে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দীপ দেখে তাদের দিকে অসম্ভব দ্রুত নেমে আসছে টিরানোসরাসের মুখ। এবার নিশ্চিত মৃত্যু।

কিন্তু না। বিশেষভাবে তৈরি কাঁচ ভাঙলো না। খুলে গেল ফ্রেম থেকে। সেই কাঁচের তলায় রিতি আর দীপ চাপা পড়ল। প্রচন্ড গর্জন করতে করতে টিরানোসরাস সেই কাঁচের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল তাদের মুখে তুলে নিতে।

মাত্র দু'ইঞ্চি দূরে ডাইনোসরের ভয়াল দাঁতের সারি, গায়ে ছিটকে লাগছে তার মুখ থেকে গরম আঠালো লালা, দু'জনে প্রায় জ্ঞান হারাতে বসল। ঠিক তখনই আবার সরে গেল মাথাটা।

এইবার মাথা দিয়ে গাড়িটাকে ঠেলতে লাগল টিরানোসরাস। অত ভারি টয়োটা ভ্যানও তার প্রচন্ড ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ল। গাড়ির নিচে মুখের অগ্রভাগ ঢুকিয়ে উপর দিকে ঠেলা দিল মূর্তিমান সন্ত্রাস। আসুরিক শক্তির প্রয়োগে উল্টে পড়ল ভবতারণের বড় সাধের প্রমোদভ্রমণের রথ।

জিপ থেকে নামতেই সুবোধ প্রামাণিকের পা পড়ল জলের স্রোতের মধ্যে। উঁচু রাস্তা থেকে তোড়ে জল নামছে নিচের নর্দমার দিকে। একটা ছোটখাটো ঝর্ণার সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলে। খানিকটা নিচে ঠিক এরকম অবস্থায় জল নিষ্কাশনের জন্য তৈরি পাকা নর্দমা। সেটা গিয়ে মিশেছে একটা জলস্রোতে। সুবোধের মনে পড়ল হেলিপ্যাডের পাশের জলাশয় থেকে দুটো জলস্রোত প্রবাহিত হয়ে ঢুকে এসেছে পার্কের ভিতরে। তারপরে শেষে গিয়ে মিশেছে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের জলা অঞ্চলে। দুটো জলস্রোতই পরে খাল কেটে তৈরি।

গোড়ালি অবধি জলে দাঁড়িয়ে সুবোধ এদিকে ওদিকে তাকায়। কোথায় গেল পুবের জাহাজ ঘাট? হঠাৎ তার নজরে পড়ে, একটু নিচে উপরের রাস্তার সমান্তরাল আর একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। চশমা মুছে আবার তাকায় সে। ঠিকই, ওই তো দেখা যাচ্ছে রাস্তা। একটু দূরে একটা পথনির্দেশক থামও রয়েছে। ওই তো পুবের জাহাজঘাটে যাবার রাস্তা। উৎফুল্ল হয়ে উঠে পা বাড়ায় সুবোধ। বেখেয়ালে পা যায় ফসকে। গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় সুবোধের বিরাট দেহ। চোখ থেকে ছিটকে যায় চশমা।

কোনো রকমে উঠে চারদিকে হাতড়াতে থাকে সুবোধ। কোথায় গেল, কোথায় গেল চশমাটা। খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। একে অন্ধকার তায় আবার জলের ধারা বয়ে চলেছে জায়গাটা দিয়ে।

মরুকগে যাক। চশমা ছাড়াই চালিয়ে নিতে হবে কাল পর্যন্ত। তার পরে চশমার কি আর অভাব হবে! কিসেরই বা অভাব থাকবে আর! কিন্তু আপাতত কী করা যায়? উপর থেকে জিপটাকে নামান যাবে বলে মনে হচ্ছে না। রাস্তাটা ধরে সোজা হেঁটে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সময় লাগবে খানিক, এই যা। বৃষ্টি আর ঝড়, দুটোই খানিকটা কমতে শুরু করেছে। মোটর বোট নিশ্চয় অপেক্ষা করবে। গা ঝাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে নিচের রাস্তার দিকে নামতে লাগল সুবোধ। সামনে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি। তার পিছন থেকে পেঁচার ডাকের মতো একটা শব্দ শোনা গেল।

দাঁড়িয়ে গেল সুবোধ। কিসের ডাক? আবার শোনা গেল সেই ডাক। ভীতিপ্রদ কিছু নয়। এগোতে গেল আবার সুবোধ প্রামাণিক। এবার গাছের আড়াল থেকে ঠিক লুকোচুরি খেলার ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল একটা বিচিত্র মুখাবয়ব।

মুখটা ঠিক যেন একটা গিরগিটি। দুটো চওড়া পাখার মতো ঝুঁটি মাথার উপর থেকে চোখের মাঝখান দিয়ে নেমে এসে এক জায়গায় মিলে গেছে। ইংরেজি হরফের 'ভি'র মতো দেখাচ্ছে ঠিক। ঝুঁটির উপর লাল কালো দাগ দাগ।

সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে জীবটা আবার পেঁচার মতো গলায় ডেকে ওঠে।

'কী করবো আমরা এখন, মিঃ চক্রবর্তি?' ন্যাট প্রশ্ন করেন।

ভবতারণ বিহ্বল চোখে তাকান। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। ভাবেন, আমারই সৃষ্ট পরিবেশ আজ আমারই সর্বনাশ করবে নাকি? হাতের ছড়িটার দিকে তাকান। পল কাটা অ্যাম্বারের বুকে আলো চমকায়। ভিতরে কুড়ি কোটি বছরের পুরনো মশার দেহ। জোর করে মনকে স্থির করার চেষ্টা করেন বৃদ্ধ। সারা জীবন ব্যবসায়িক জগতের নির্দয় জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। কোনো বাধা তাঁকে থামাতে পারেনি। আজকে প্রাগৈতিহাসিক বিপদ তাঁকে কাবু করবে? কক্ষনো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। হতেই হবে। মিছিমিছি ভয় পাচ্ছি আমরা, ভাবেন তিনি। জন্তুজানোয়ারগুলো এখনও নিয়ন্ত্রণেই আছে। একটু পরেই সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

'এক এক করে ভাবুন সবাই কী করতে হবে।' ভবতারণের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফিরে এসেছে। 'প্রথমত, ওদের পাঁচজনকে ফিরিয়ে আনা দরকার। জিপ নিয়ে যান তো অ্যালান। ওদের নিয়ে আসুন। আমার নাতি-নাতনি যেন অক্ষত দেহে ফেরে।'

অ্যালান কাজের মানুষ, বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বেঁচে ফিরেছেন অনেক মারাত্মক পরিস্থিতি থেকে। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি দরজার দিকে এগোন। 'আমিও যাবো', রায়াও চলেন তাঁর সঙ্গে।

বাধা দিতে গিয়েও চুপ করে যান ভবতারণ। দু'জন যাওয়াই ভালো।

'কী? কী চাই তোর?' সুবোধ প্রশ্ন করে বিচিত্র জীবটাকে।

তিন চার বার গাছের আড়াল থেকে উঁকি মারার পর সামনে এসেছে প্রাণীটা। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ বলেই মনে হচ্ছে। দশ ফুট লম্বা শরীর। ভারি লেজ, শক্তিশালী দুটো পিছনের পা, লম্বা গলা! সারা শরীরে হলদে কালো চাকা চাকা দাগ, অনেকটা চিতাবাঘের মতো। দেখতে বেশ সুন্দর।

'তোর চেহারাটা দেখছি তোর অন্য ভাইবেরাদরদের মতো নয়। তা বেশ, তা বেশ। কিন্তু আমার কাছে কী চাও বাছা? আমার সময় নেই এখন, নইলে লুকোচুরি খেলা যেত। চলি ভাই।'

পথ আটকে আছে জন্তুটা। সুবোধ পিছন ফিরে অন্যদিক দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। আবার ডেকে ওঠে মোরগঝুঁটি।

'ব্যাটা, ভেবেছিস কী? আমাকেও ডাইনোসর ঠাওরালি নাকি? দেখ, তাকিয়ে,' বর্ষাতিটা নামায় সুবোধ, 'আমি মানুষ, বাবা।'

তাকিয়েই থাকে জীবটা। মাথা কাত করে দেখতে থাকে সুবোধকে। ঠিক যেন কথাগুলো শুনছে।

'খাবারটাবারও নেই আমার কাছে।' একটা গাছের ডাল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে জন্তুটার পিছনে ফেলতে ফেলতে সুবোধ বলে, 'আ চুঃ চুঃ, ধর, ধর ওটাকে।'

একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে আবার সুবোধের দিকে চেয়ে থাকে অদ্ভুতদর্শন জানোয়ারটা। পথ ছাড়ে না কিছুতেই।

'আ গেল যা, ভালো মুশকিলেই পড়া গেল।' এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না, সুবোধ ভাবে। উপরের রাস্তা থেকে অন্য পথে নিচে নামতে হবে। পিছন ফিরে আবার কোনো রকমে উপর দিকে উঠতে থাকে সে। জিপের পাশে পৌঁছে দাঁড়িয়ে একটু হাঁপ ছাড়ছে, আবার শোনা যায় সেই পেঁচার ডাক। এবার খুব কাছে। জীবটা পিছন পিছন উপরে উঠে এসেছে।

বিরক্ত হয়ে সুবোধ ফিরে দাঁড়ায়। হাত নেড়ে বলে, 'যা, দূর হয়ে যা, হতচ্ছাড়া!'

হঠাৎ প্রাণীটা কর্কশ কণ্ঠে ডেকে ওঠে। আচমকাই ঘাড়ের চারপাশে ফুলে জেগে ওঠে গোল পাখনার মতো ডানা। মুখব্যাদান করে, ধারালো হিংস্র দাঁতের সারি দেখিয়ে, সাপের মতো তার লকলকে কালো জিভ বার করে, একবার একটু পিছু হেলিয়ে সামনের দিকে সে মাথা ঝাঁকুনি দেয়। থক্ করে একদলা থুতু পড়ে সুবোধের বুকের উপর। ঘেন্নায় শিটিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে তা মুছে নেবার চেষ্টা করে সুবোধ। ঘন চটচটে আঠার মতো থুতু। হাতটা জ্বালা করে ওঠে যেন।

কী জঘন্য জীব রে বাবা, ভাবতে ভাবতে সুবোধ প্রামাণিক তাড়াতাড়ি জিপের ভিতরে ঢুকে পড়ে। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয়। কী করা যায় এবার? বুকের কাছে আর হাতে জ্বালাটা বাড়ছে যেন! তাহলে—

জানলার কাঁচের উপরে প্রবলভাবে ঝটপট করে ওঠে প্রাণীটার ডানা আর হাত। মুহূর্তের মধ্যে কাঁচটা ভেঙে যায়। হতচকিত সুবোধের মুখের উপরে বারে বারে থুতু ছিটোতে থাকে জীবটা। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে সুবোধ। চোখ জ্বলে যাচ্ছে। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। মুখের চামড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা। কুরে কুরে কেউ যেন মাংস খাচ্ছে গাল থেকে। যন্ত্রণায় উন্মাদ, অন্ধ সুবোধ কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে হাতল ঘুরিয়ে উল্টো দিকের দরজা খোলে। নামতে গিয়ে কপাল ঠুকে যায় দরজার উপরে। চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে যায় তার পৃথুল দেহ। পকেট থেকে গড়িয়ে বাইরে পড়ে যায় ডাইনোসর-ভ্রূণে ভরা শেভিং ক্রিমের কৌটো। গড়াতে গড়াতে জিপের তলা দিয়ে চলে যায় নর্দমার জলে।

প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও সুবোধ টের পায়, একটা ভারি দেহ এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। পেটের উপর একটা ধাক্কা লাগে প্রথমে। পর মুহূর্তেই অসহনীয় একটা ব্যথা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। হাত বাড়িয়ে পেট চেপে ধরতে গিয়ে হাতে গরম গরম দড়ির মতো কী যেন ঠেকে। অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও সুবোধ বোঝে দড়ি নয়, ওগুলো তার নাড়িভুঁড়ি। এবার কপালের দুপাশে প্রচন্ড চাপ আর ছুরি ঢুকে যাওয়ার ব্যথা লাগে। প্রাণীটা তার

মাথাটা কামড়ে ধরেছে। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও সুবোধের মস্তিষ্কের একটা অংশ হিসাব করতে থাকে আর বড় জোর আধ মিনিট বাঁচবো। তারপরেই বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায় সুবোধ প্রামাণিক। মৃত্যু এসে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটায়।

যদি কখনও পার্কের ভিজিটরস্ সেন্টারে মন দিয়ে ডাইনোসরদের কথা পড়ত সুবোধ প্রামাণিক, তাহলে বুঝতে পারত এই প্রাণীটা একটা ডাইলোফসর, প্রাচীনতম ডাইনোসরদের একটি। বিজ্ঞানীরা আগে মনে করতেন ওদের চোয়ালের পেশি শিকার ধরার জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। পার্কে দেখা গেছে এরা বিষধর। আধুনিক জগতের সরীসৃপ গিলা মনস্টার আর র‍্যাটল স্নেকদের মতো এদের মুখের লালা গ্রন্থি থেকে এক ধরনের মারাত্মক বিষ বের হয়। তার প্রভাবে শিকার সংজ্ঞা হারায় দু'এক মিনিটের মধ্যেই। তখন ধীরে সুস্থে তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ডাইলোফসর।
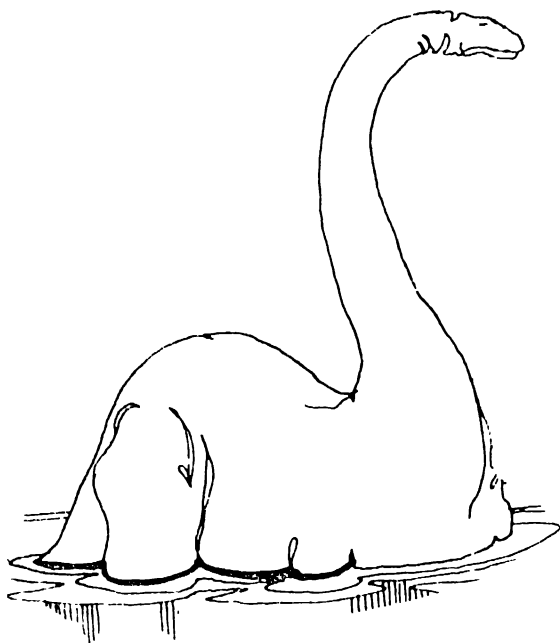
মূর্তিমান আতঙ্ক

প্রচণ্ড আক্রোশে উপর্যুপরি গর্জন করতে করতে উল্টে পড়া ভ্যানটাকে আক্রমণ করল টিরানোসরাস। গাড়িটাকে একটা জীবিত কিছু বলে মনে হয়েছে তার। কামড়ে ধরে এক ঝাঁকুনিতে ছিঁড়ে নিল একটা চাকা। সেটা ফেলে দিয়ে ধরল আর একটা। সেটা ছেড়ে আর একটা। তার ধাক্কায় গাড়িটা এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগল একটা খেলনার মতো। উন্মত্ত হুংকারে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। তার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে গাড়ির মধ্যে আটকে পড়া দুই ভাইবোনের আর্তনাদ।

অসহায় অজিত আর রাকেশ দেখছেন টিরানোসরাসের অবাধ ধ্বংসলীলা। বিকট হাঁ করে গর্জন করছে দানবীয় সরীসৃপ। সামনের দুটো হাত, অদ্ভুত রকমের ছোট আর আপাতদৃষ্টিতে ব্যবহারের অযোগ্য, উঠছে নামছে শরীর সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে। দেখতে দেখতে একটা পা গাড়ির উপরে তুলে ধরল সেই অতিকায় প্রাণী। তার প্রবল চাপে ক্রমশ চেপ্টে যেতে লাগল ভ্যানটা। আর দু'এক মিনিটের মধ্যেই ভিতরে বাচ্চা দুটোও নিষ্পেশিত হয়ে যাবে। ব্যাকুল হয়ে অজিত গাড়ির ভিতরটা হাঁটকাতে লাগলেন। যদি কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়। যদি কোনো উপায়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় অন্য কোনো দিকে।

গাড়ির ভিতরে উপুড় হয়ে শোওয়া রিতি আর দীপ ততক্ষণে ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। দানবিক দেহটার প্রত্যেক সঞ্চালন গাড়িটাকে আরও আরও চেপে দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই গাড়ির মেঝে তাদের পিঠ ছুঁতে চলেছে। একটা আসনের তলায় চাপা পড়ে দীপ একটুও নড়তে পারছে না। সামনে জানলার ফাঁক দিয়ে রিতি টিরানোসরাসের একটা পা দেখতে পাচ্ছে। নাকে আসছে শরীরটার শ্বাপদ গন্ধ। পচা মাংসের দুর্গন্ধে চারদিক ভরে আছে।

আসনের পাশে রাখা বাকসের মধ্যে অবশেষে অজিত পেলেন কতগুলো রাসায়নিক মশাল। তারই একটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে নামলেন তিনি। আর কোনো পথ নেই। মশালটার এক প্রান্তের ঢাকনা ছিঁড়ে ফেলতেই জ্বলে উঠল আগুনের শিখা। মাথার উপরে সেই জ্বলন্ত মশাল এদিকে ওদিক নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন—এদিকে, এদিকে। আন্দোলিত মশালের শিখা দেখে থামল টিরানোসরাস। আকাশের দিকে মুখ তুলে রাক্ষুসে চোয়ালের মধ্যে দাঁতের করাল সারি প্রকাশিত করে হুংকার ছাড়ল সে। তারপর ধেয়ে এল অজিতের দিকে।

হঠাৎ অজিত দেখলেন, গাড়ির ডানদিক থেকে মশাল হাতে ছুটে গেল আর একটা মূর্তি। রাকেশ। উল্টে পড়ে থাকা ভ্যানের পাশে টিরানোসরাসের প্রায় মুখের কাছে মশাল নেড়ে চিৎকার করে ডাকলেন তাকে। তার পর পিছনে ফিরে দৌড়ে ফিরে আসতে লাগলেন রাকেশ। অজিতের দিকে আর মন না দিয়ে এবার রাকেশের পিছু নিল দানব। ছুটতে ছুটতে রাকেশ ছুঁড়ে দিলেন মশালটা বনের দিকে। পাশ ফিরে অন্যদিকে ছুটতে চাইলেন। কিন্তু ঘন্টায় বত্রিশ মাইল গতিতে ছুটতে সক্ষম টিরানোসরাস তাঁর পিঠের একেবারে কাছে। মশালটাকে উড়ে যেতে দেখে তারও দৃষ্টি চলে গেছে সেই দিকে। রাকেশকে ছেড়ে সেদিকেই ছুটল সে। কিন্তু যাওয়ার আগে তার মাথার ধাক্কা লাগল রাকেশের পিঠে।

রাকেশের মনে হল তাঁকে কেউ যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল আকাশের দিকে। তারপরেই প্রচণ্ড বেগে উঠে এসে তাঁকে আঘাত করল পৃথিবীর মাটি। গাঢ় অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেল দুনিয়া।

টিরানোসরাস সে দিকে দৃকপাত না করে ছুটল মশালটার দিকে। সেটা তখন কাঠের সেই ছোট্ট খুপরিটার চালে আটকে ধিকি ধিকি জ্বলছে। সেই খুপরির ভিতরে কাঁপছেন চার্লস মারিনেত্তি।

এক লহমায় টিরানোসরাসের মাথার ধাক্কা চুরমার করে দিল তক্তা দিয়ে তৈরি পলকা কুঠুরি। দেখা গেল বসে আছেন চার্লস। দু'হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। টিরানোসরাস দাঁড়িয়ে যায়। গলার মধ্যে বিভৎস ঘড়ঘড় শব্দ করতে থাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করতে থাকে যেন। দু'তিন সেকেণ্ড কিছু ঘটে না। চার্লস যেন একটু ভরসা পান। মুখ থেকে হাত সরিয়ে চোখ তুলে তাকান। দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস লাগে মুখে। বৃষ্টিতে ততক্ষণে ভিজে গেছেন তিনি। চুল ভিজে লেপ্টে গেছে কপালে। দু'হাতে সেই চুল ঠেলে মাথায় তুলে টাক ঢাকার চেষ্টা করেন চার্লস।

তিনি নড়ে উঠতেই টিরানোসরাস হাঁ করে। মুরগি যেমন ঠোক্কর দিয়ে মাটি থেকে পোকা তুলে মুখে পোরে, ঠিক তেমনি রাক্ষুসে জীব চার্লসকে তুলে নেয় মুখে। দুই প্রকান্ড চোয়ালের মধ্যে চার্লসের কোমর অবধি শরীর ঢুকে যায়। তাঁর করুণ আর্তনাদ হারিয়ে যায় গুহার মতো মুখবিবরে। মুখ বন্ধ করে টিরানোসরাস। কোমরের কাছ থেকে দ্বিখন্ডিত চার্লসের নিম্নাঙ্গ মাটিতে পড়ে যায়। অঝোরে রক্ত গড়িয়ে পড়ে অপরিমেয় ক্ষুধার প্রতিমূর্ত্তির কষ বেয়ে।

এদিকে অজিত তখন গাড়ির তলা থেকে কোনো রকমে রিতিকে টেনে হিঁচড়ে বার করতে পেরেছেন। আসনের তলায় আটকা দীপকে কিছুতেই বার করতে পারছেন না। টানতে গেলেই কোমরে কিছু একটা বেধে যাচ্ছে। রিতিও চেষ্টা করছে ভাইকে বার করতে।

আবার টিরানোসরাস গর্জন করে ওঠে। রিতি মুখ ঘুরিয়ে দেখে মাটি থেকে চার্লসের বিচ্ছিন্ন নিম্নাঙ্গ মুখে তুলে নিয়েছে ভয়াল ডাইনোসর। তার হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে চার্লসের পা। বিভৎস সেই দৃশ্য দেখে রিতি আবার চিৎকার করে ওঠে। অজিত ঝটিতি তার মুখ চেপে ধরেন। ফিসফিস করে বলেন, 'চুপ, একটুও শব্দ করো না।'

কিন্তু ততক্ষণে টের পেয়ে গেছে চলমান আতঙ্ক। পায়ে পায়ে আবার এগিয়ে আসে সে অজিত আর রিতির দিকে। অজিত দাঁড়িয়ে থাকেন পাথরের মতো। তাঁকে দেখে, তাঁর হাত চেপে ধরে রিতিও চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু তার বিস্ফারিত চোখ দেখে বোঝা যায় ঠিক কতখানি ত্রাসে তার মন আচ্ছন্ন। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে তার স্থির হয়ে থাকার মানসিক শক্তি।

কাছে আসে টিরানোসরাস। আরও কাছে। আরও কাছে। একেবারে বুকের সামনে চলে এসেছে এবার তার নাক। তার গরম নিঃশ্বাস লাগে অজিতের গায়ে। গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের গায়ের গন্ধের চাইতে অনেক বেশি শ্বাসরোধ-করা সেই গন্ধ। দেখতে পান অজিত, এক একটা দাঁত ছয় ইঞ্চি লম্বা। নাকের উপরে, চোয়ালের পাশে তখনও রক্তের ছোপ। আশ্চর্যের কথা, এত কাছে এসেও তাদের আক্রমণ করে না জীবটা। তার হাবভাব দেখে মনে হয়, তাঁদের যেন সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে না? এত কাছে এসেও? কী ব্যাপার?

এমন বিপদের মুহূর্তেও অজিতের অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক মন এর কারণ খোঁজে। উত্তরটাও ধরা পড়ে। ডাইনোসর ডিএনএ তন্ত্রীর ফাঁক ভরাট করতে উভচর ব্যাঙের ডিএনএ-তন্ত্রীর অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই উভচরদের কিছু শারীরবৃত্তিয় বৈশিষ্ট্য চলে এসেছে বিভিন্ন ডাইনোসরের দেহে। ব্যাঙের দৃষ্টি-ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা কেবল গতিশীল জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়, যা অনড় তা তাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। পোকামাকড় তারা দেখতে পায় নড়ে বলে। উভচরদের এই বৈশিষ্ট্য টিরানোসরাস জন্মসূত্রে পেয়ে গেছে। তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অজিত আর রিতি তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

কিন্তু দেখতে না পেলেও আশেপাশে যে শিকার রয়েছে তা সে বুঝতে পারছে হিংস্র শ্বাপদের জৈবিক বোধ থেকে। শুধু কোথায় তা না বোঝায় খানিকটা অবাক হচ্ছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রাণ কাঁপানো গর্জন করে ওঠে টিরানোসরাস। তার ছুরির মতো দীর্ঘ আর ধারালো ছুরকুটে দাঁতের সারি অন্ধকারেও

ঝকঝক করে ওঠে। চোয়াল বেয়ে লালা গড়ায়। খানিকটা পড়ে অজিত আর রিতির গায়ে।

অজিত হাতের পেশীতে অনুভব করেন, রিতির ছোট শরীরটা ঠকঠক করে কাঁপছে। অজিত ভাবেন, সাবাস মেয়ে, ভয় পেয়েও কেমন নিজেকে সামলে রেখেছে। আবার ডেকে ওঠে টি-রেকস্। ও চেষ্টা করছে ভয় দেখাতে, ভাবছে ভয় পেয়ে আমরা নড়ে উঠবো আর ও দেখতে পাবে আমাদের।

দীপ এত কিছু দেখতে পাচ্ছে না। উল্টে পড়া গাড়ির জানলার ফাঁক দিয়ে সে কেবল কয়েকটা পা দেখতে পাচ্ছে। ডাক শুনে শিউরে উঠে বাইরে বেরোবার প্রাণপণ একটা চেষ্টা করে সে। তার সেই নড়াচড়ায় গাড়িটাও নড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা দেখতে পায় দুশমন। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে গাড়িটার উপরে। এক ধাক্কায় গাড়িটা ঘুরে যায়। সেই সুযোগে গাড়ির আড়ালে চলে যান অজিত রিতিকে টেনে নিয়ে। আর এক ধাক্কায় আবার অপর দিকে ঘোরে গাড়ি। ভিতর থেকে শোনা যায় দীপের আর্ত চিৎকার। গাড়ির পিছনে কোনো রকমে লুকোতে চেষ্টা করে চলেন অজিত, রিতির হাত ধরে।

কিন্তু আর থাকা যাচ্ছে না গাড়ির আড়ালে। ঘষটাতে ঘষটাতে গাড়িটাকে এনে ফেলেছে দেওয়ালের একেবারে গায়ে। এবার চাপা পড়তে হবে। লাফিয়ে দু'জনে দেওয়ালের উপরে উঠে পড়েন। বৃষ্টির জলে পিচ্ছিল হয়ে আছে সে জায়গাটা। পা হড়কে যাচ্ছে। যেমন করে হোক দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। গাড়িটার মুখ দেওয়ালের উপরে উঠে আসে। কী উপায় এবার ?

তারগুলো ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। চট করে রিতিকে পিঠে তুলে নিয়ে একটা তার ধরে দেওয়ালের বাইরের দিকে ঝুলতে ঝুলতে নেমে পড়েন অজিত। রিতি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে দু-হাত দিয়ে। চাপে অজিতের দম বন্ধ হয়ে আসে। 'দ-ম নি-তে পা-র-ছি-না, হা-ত আ-ল-গা ক-র', বলেন অজিত। রিতি করবেই বা কী? উপর থেকে গাড়িটা এবার পড় পড় হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে নিচে পড়বে। নিষ্ক্রিয় হয়ে ঝুলে থাকলে

গাড়ির সঙ্গে নিচে পড়ে মরতে হবে। এদিক ওদিক তাকান অজিত।

ওই তো, ওই একটু ওপাশে আর একটা তার ঝুলে আছে। 'হা-ত বা-ড়ি-য়ে ও-টা ধ-রা-র চে-ষ্টা ক-র', বলেন অজিত। সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে শরীর দুলিয়ে রিতির হাত এগিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। হাত পৌঁছয় না। আবার চেষ্টা করেন। আবার বিফল হয় রিতি। গাড়িটা পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে। অজিত আবার দেওয়ালের গায়ে পা লাগিয়ে শরীর দুলিয়ে চেষ্টা করেন তারটার কাছে পৌঁছবার। অনেকটা সরে যান গাড়িটার পতনের পথ থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই গাড়িটা কড়কড় শব্দে দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে নিয়ে নিচের দিকে পড়ে যায়। এক চুলের জন্যে বেঁচে যান অজিত আর রিতি। ততক্ষণে আবার তার ধরে ঝুলতে ঝুলতে আগের জায়গায় ফিরে এসেছেন দু'জনে।

নিচে তাকিয়ে দেখেন অজিত, গাড়িটা আটকে গেছে একটা গাছের মগডালে। উপরে তাকান। টিরানোসরাস মুখ বাড়িয়ে তাকায় তাঁদের দিকে। বিফল মনোরথ ভয়ঙ্কর আবার গর্জে ওঠে। চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। এতক্ষণে বৃষ্টিটা থামে। দেওয়ালের উপর থেকে গড়িয়ে জল পড়ে। এবার তার ধরে দেওয়াল বেয়ে নামতে থাকেন অজিত। পিঠে রিতি। দীপের কী হল কে জানে।

কী করে কোন দিক দিয়ে মাটিতে পৌঁছন অজিত তা তিনি নিজেও বলতে পারবেন না। রিতির ছোট্ট শরীরটা শক্ত কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ ঠিক থাকতে পারবে কে জানে। দেওয়ালের গায়ে জল বেরোবার নর্দমার একটা বিরাট পাইপ বেরিয়ে আছে। মোটা স্রোতে জল পড়ছে সেখান থেকে। সেই জলের ধারার নিচে দাঁড়ান অজিত। শরীর থেকে ক্লান্তি ধুয়ে ফেলতে সচেষ্ট হন। প্রতিটি মাংসপেশি তিরতির করে কাঁপছে, শরীর ভেঙে আসছে। কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি। দীপ এখনও গাড়ির ভিতরে বন্দি।

চিৎকার করে ডাকেন অজিত, 'দীপ! দীপ! শুনতে পাচ্ছো?' ক্ষীণ স্বরে উত্তর আসে, 'পাচ্ছি।'

'ভয় পেয়ো না, আসছি আমি।'

রিতি বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে। অজিত বলেন, 'রিতি, শোনো। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি দীপকে নানিয়ে আনছি।'

'যদি ..... যদি আবার আসে .... ?' রিতির গলা আতঙ্কে কাঁপে।

'আসবে না।'

ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। অজিত উপর দিকে তাকিয়ে ভাবেন, অন্তত তিরিশ ফুট উঁচু হবে। বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে, তবে চড়তে অসুবিধা হবে মনে হয় না।

গাছটায় উঠতে শুরু করেন অজিত। ডাল থেকে ডালে উঠতে অসুবিধা নেই। বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না।

উঠে এসেছেন সবচেয়ে উঁচু ডালটায়। নিচের দিকে মুখ, খাড়া হয়ে আটকে আছে গাড়ি। মাঝে মাঝে দুলে উঠছে। সন্তর্পণে দরজাটা খোলেন অজিত। ডাকেন, 'দীপ?'

'এই যে আমি,' সাড়া দেয় দীপ।

'আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসো, খুব সাবধানে।'

খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় দীপ। গাড়িটা নড়েচড়ে একটু সরে যায় ডালের উপরে। দীপ থেমে যায়। 'এসো, আস্তে এসো।' দীপ আবার এগোয়। গাড়িটা আবার দুলে ওঠে। আচমকা ফুট খানেক হড়কে যায় ডালের উপর। আবার থামে দীপ। আবার এগোয়। এসে গেছে দরজার কাছে। হাত বাড়িয়ে দেন অজিত। হাত ধরে বেরিয়ে আসতে গিয়েও থমকে যায় দীপ। পাশের ডালে অজিত। দু'জনের মাঝখানে হাত খানেক ব্যবধান। সেই ফাঁক দিয়ে মাটি দেখা যাচ্ছে অনেক নিচে। দীপের মাথা ঘুরে ওঠে। বলে, 'উঁচু জায়গা সহ্য করতে পারি না আমি।'

সর্বনাশ, মনে মনে শঙ্কিত হন অজিত। এই ডালে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। যে কোনো মুহূর্তে গাড়িটা নিচে পড়ে যাবে। নরম গলায় বলেন, 'দেরি করা যাবে না দীপ। চলে এস। নিচের দিকে তাকিও না, আমার হাত ধর।' এগোয় না দীপ। জোরে চেপে চোখ বন্ধ করে আছে। 'তোমার দিদি নিচে একা দাঁড়িয়ে আছে। তুমি না নামলে ওকে দেখবে কে?' এই কথায় চোখ খোলে দীপ। হাত বাড়িয়ে দেয়। অজিত ওকে ধরে ধরে বার করে নেন গাড়িটা থেকে। আবার দুলে ওঠে গাড়ি। হুড়মুড় করে ফুট খানেক নিচে পড়ে যায় ডাল ভেঙে। আবার আটকে যায়।

দু'জনে নামতে থাকেন এবার। মাথার উপরে ঝুলছে গাড়িটা। দীপের সারা গায়ে যন্ত্রণা। মুখের বিভিন্ন জায়গা কেটে ছিঁড়ে গেছে। পিঠে ভীষণ ব্যথা। একটু থামেন দু'জনে বিশ্রাম নিতে। ঠিক তখনই পট পট করে ডাল ভেঙে ছরছর করে পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে গাড়িটা নিচের দিকে পড়ে যেতে থাকে।

'থামা যাবে না, নামতে থাকো,' বলেই তাড়াতাড়ি নামতে আরম্ভ করেন অজিত। প্রায় একই সঙ্গে গাড়িটা দুরদার করে পড়তে থাকে তাঁদের দিকে। 'তাড়াতাড়ি নামো, নামো, নামো,' চিৎকার করে অজিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খানিকটা পিছলে খানিকটা ডাল বেয়ে নামতে থাকেন। প্রাণের দায়ে উচ্চতার ভয় ভুলে দীপও নামতে থাকে দ্রুত।

তাঁরাও নামছেন, গাড়িটাও পড়ছে। ঘটনাটা ঘটল কয়েক মুহূর্তে, কিন্তু অজিতের মনে হল সব কিছু স্লো মোশনে চলা চলচ্চিত্রের দৃশ্য যেন। অজিত আর দীপ মাটিতে নেমে কয়েক পা যেতে না যেতেই বিশাল টয়োটা ভ্যান মুখ থুবড়ে এসে পড়ল গাছটার গোড়ায়।

অবসন্ন শরীরে তখন মাটিতে বসে পড়েছেন অজিত। দীপ পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। দূরে কোথাও আবার শোনা গেল, গর্জে ফিরছে টিরানোসরাস রেকস্। এখন সে ডাইনোসর পার্কের একচ্ছত্র অধিপতি।

চারদিক শুনশান। কোথাও কেউ নেই। রাস্তার মাঝখানে একটা শূন্য টয়োটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে গাছ থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। অ্যালান আর রায়া জিপ থেকে নামলেন। তাঁদের হাতের টর্চদুটোর আলোয় এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন তাঁরা। রায়া চিৎকার করে ডাকলেন, 'অজিত! অজিত!' কোনো সাড়া নেই। অ্যালান ডাকলেন, 'দীপ! রিতি! রাকেশ!' সব নিঃশব্দ। দূরে কোথাও একটা ডাইনোসরের গর্জন শোনা গেল। কোথায় গেল সবাই? টিরানোসরাসের বেড়ার তার ছেঁড়া। তাহলে কি—?

হঠাৎ একটা খস খস শব্দে সামনের একটা ঝোপের দিকে নজর গেল রায়ার। এগিয়ে দেখলেন রক্তাক্ত একটা পা বেরিয়ে আছে। একটু একটু নড়ছে সেই পা।

দ্রুত ডালপালা সরালেন রায়া। ততক্ষণে অ্যালানও ছুটে এসেছেন। রক্তশূন্য মুখ, অদ্ভুতভাবে বেঁকে আছে পা, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, পড়ে আছেন রাকেশ।

চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে চোখ মেললেন রাকেশ। চমকে ছটফট করে উঠলেন। 'কোথায়, কোথায় আমি?' এদিকে ওদিক তাকিয়ে আবার বলেন, 'চলে গেছে? চলে গেছে রাক্ষস?'

'কার কথা বলছো? কী হয়েছে? সবাই কোথায় গেল?'

কোনো রকমে, ঢোঁক গিলতে গিলতে, থেমে থেমে রাকেশ বললেন কী হয়েছিল তিনি অজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত। 'তার পরে আর কিছু জানি না। তবে এতক্ষণে ওরা কি আর—। তাড়াতাড়ি চলুন এখান থেকে। যে কোনো মুহূর্তে আবার ফিরে আসতে পারে সাংঘাতিক জানোয়ার।'

তাঁর কথা সত্যি প্রমাণ করতেই যেন দূরে কোথাও ডেকে ওঠে টিরানোসরাস। অন্ধকার রাত ত্রস্ত হয়ে ওঠে পৈশাচিক সেই শব্দে। 'কিন্তু অজিত, রিতি, দীপ? ওদের কী হবে?'

'দেখুন খুঁজে তাহলে'। রাকেশের গলায় নৈরাশ্য।

রায়া ছুটে যান দেওয়ালের দিকে। মাটিটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে ভয়ানক কোনো কান্ড ঘটে গেছে খানিক আগে। মাটিতে এখানে সেখানে জল জমে আছে অল্প অল্প। তারই একটার মধ্যে পড়ে আছে একটা 'ডাইনোসর পার্ক গাইডবুক'। খোলা পাতার উপরে লেখা রয়েছে, রায়া টর্চের আলোয় পাঠ করেন, 'নির্ভয়ে নিরাপদে দেখুন ডাইনোসরদের কান্ডকারখানা।' অতি দুঃখেও হাসি পায় রায়ার।

দেওয়ালের ওপাশে ঝুঁকে পড়ে নিচে তাকান রায়া। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। তবু চেয়ে থাকেন। টর্চের আলো খুব আবছা হয়ে পড়েছে নিচে। কিচ্ছু নেই। কিন্তু..... হ্যাঁ.... ওই তো, ওই তো উল্টে পড়ে আছে একটা ভ্যান। চিৎকার করে বলেন রায়া, 'অ্যালান, দেখতে পেয়েছি। গাড়িটা নিচে পড়ে আছে।

ভিতরে নিশ্চয় আছে ওরা তিনজন।'

কোনো রকমে রাকেশকে জিপের পিছনে বসিয়ে ছুটে যান অ্যালান আর রায়া নিচের জঙ্গলের দিকে। পিছনের পায়ে চলা পথ দিয়ে।

কিন্তু বৃথাই আসা। গাড়িতে কেউ নেই। রায়া ডাকেন সকলের নাম ধরে। উত্তর নেই। অ্যালান টর্চ ফেলে দেখেন গাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে দু'জন মানুষ। ভিজে মাটিতে পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

জিপে বসে শঙ্কিত চিত্তে চারদিক দেখছেন রাকেশ। বারে বারে মনে পড়ছে ধাবমান টিরানোসরাসের চেহারা। নাকে এখনও লেগে রয়েছে তার শরীরের বোঁটকা গন্ধ।

হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে মাটিতে জমে থাকা জলের দিকে। জলটা কাঁপছে। মাটিটাই এবার কেঁপে ওঠে। আবার আসছে সেই পিশাচ। কোথায় গেল ওরা দু'জন!

জঙ্গলের মধ্যে এবার দেখা যায় টর্চের আলো। ফিরে আসছেন রায়া আর অ্যালান। রাকেশ চিৎকার করে ওঠেন, 'চলে আসুন, চলে আসুন। ওই আসছে আবার!'

প্রাণপণে ছুটে এসে জিপে ওঠেন রায়া আর অ্যালান। জিপ চালু করেন অ্যালান। দু'এক ফুট এগোতে না এগোতেই জঙ্গল ভেদ করে সগর্জনে বেরিয়ে আসে টিরানোসরাস। ধেয়ে আসে জিপের দিকে।

ব্র্যাকিওসরাসের হাঁচি

ভবতারণ বলেছিলেন, রায়ার মনে পড়ে যায়, টিরানোসরাস ঘণ্টায় বত্রিশ মাইল বেগে দৌড়তে পারে। তাই কি? জিপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনে হচ্ছে আরও অনেক জোরে ছুটে আসছে টি-রেকস্।

রাকেশ পিছনের আসনে উল্টো দিকে মুখ করে বসে আছেন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, অল্পই পিছনে রয়েছে ভয়ঙ্কর দানব। ধরে ফেলল বলে। জিপের ঝাঁকুনিতে তাঁর ভাঙা পায়ে প্রচণ্ড লাগছে। কিন্তু আসন্ন সম্ভাব্য মৃত্যুর চিন্তায় সে-যন্ত্রণার কথা মনেই নেই। সমস্ত চেতনা তাঁর এই মুহূর্তে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে তেড়ে আসা ওই রাক্ষুসে মুখব্যাদানে। ধরে ফেলল বোধ হয় এক্ষুনি। গর্জনে কান ফেটে যাচ্ছে। জিপের আওয়াজ শোনাই যাচ্ছে না।

জিপের গতি আরও বাড়ান অ্যালান। বহু বার পাগলা হাতির তাড়ার সামনে জিপ নিয়ে ছুটে পালিয়েছেন তিনি। কিন্তু সে তো পরিচিত প্রাণী। চেনা তার গতি প্রকৃতি। এই বিভীষিকার কাছে মত্ত হস্তীর আক্রমণ কিছুই নয়। সভয়ে আয়নায় দেখেন অ্যালান, টি-রেকসের করাল দংষ্ট্রা জিপ ধরে ফেলল বলে। তবু মাথা ঠাণ্ডা রাখেন অ্যালান। হাত কাঁপে না। ভিজে রাস্তা পিছল। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে রাখেন তিনি।

টিরানোসরাসের মুখ এখন রাকেশের মাথার উপরে। তার লালা ছিটকে লাগে গায়ে। কোটর থেকে ঠিকরে বেরোতে চায় রাকেশের চোখ। হাঁ করে ছোঁ মারে এবার পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্বারতম শ্বাপদ।

ঠিক তখনই পথের গর্ত এড়াতে বাঁদিকে সামান্য ঘোরে জিপের মুখ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় পাশবিক চোয়াল। বিফল হয়ে আক্রোশে টি-রেকস্ গর্জে ওঠে, কিন্তু গতি হ্রাস করে না।

একটা গাড্ডায় পড়ে লাফিয়ে ওঠে জিপ। রায়া মুখ ঘুরিয়ে দেখেন। আজ বাঁচার আশা নেই আর। আর দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই ধরা পড়তে হবে।

একটা গাছের তলা দিয়ে গেছে রাস্তাটা। ঝড়ে সে গাছের একটা ডাল নেমে এসেছে নিচে। তার তলা দিয়ে বেগে ছুটে যায় জিপ। সকলে মাথা নামিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। তবু ডালপালার আঘাতে সকলেরই কাঁধ মুখ ছড়ে যায়। বিশালদেহী টিরানোসরাস সেই ডালে আটকে যায় সাময়িকভাবে। কিন্তু তার অত বড় শরীরের ধাক্কায় ডালটাই ভেঙে ছিটকে যায়। ছুটে আসতেই থাকে ক্রোধোন্মত্ত মাংসলোলুপ শ্বাপদ।

কিন্তু এইবার তার গতি কমে। জিপের সঙ্গে ব্যবধান তার বাড়তে থাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাকেশ তাকিয়ে থাকেন পিছনে টিরানোসরাসের অপসৃয়মান মূর্তির দিকে।

এতক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন অ্যালান। আপাতত রেহাই পাওয়া গেছে। সোজা রাস্তায় জিপ ফিরে চলে।

টিরানোসরাসের লাগাতার গর্জনে রিতি কেঁপে ওঠে বারে বারে। চারদিকে তাকান অজিত। কোথাও একটা আশ্রয় চাই। মাটিতে থাকা নিরাপদ হবে না। যে কোনো মুহূর্তে আবার আক্রমণ হতে পারে। একবার পার পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়বার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নাও হতে পারে। তাছাড়া, এই জঙ্গলে হিংস্র মাংসাশী অন্য কোনো আধুনিক প্রাণী না থাকলেও সাপ নিশ্চয় আছে। তাদের হাত থেকেও তো বাঁচতে হবে।

দীপ বলে, 'কাকু, খিদে পেয়েছে। সেই বিকেল থেকে কিছু খাইনি।'

'আর কিছুক্ষণ সহ্য করতেই হবে ক্ষিদের জ্বালা, দীপ। সকাল হলেই রাস্তা খুঁজে ফিরবো আমরা।'

'আমারও খিদে পেয়েছে,' রিতির মুখে কথা ফোটে এতক্ষণে।

একটু এগোতেই একটা বিশাল গাছের তলায় এসে পৌঁছন অজিত। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না ভালো, তবে মনে হচ্ছে এর পরে আর বড় গাছের জঙ্গল নেই হয়তো মাঠ শুরু হবে। ভিজিটরস্ সেন্টারে দেখা পার্কের ম্যাপটা মনে করার চেষ্টা করেন অজিত। টিরানোসরাসের এলাকা থেকে বেরোতে গেলে উত্তরে হাঁটতে হবে। তারপর উত্তরদিকে পড়বে ব্র্যাকিওসরাস আর অন্য তৃণভোজীদের মাঠ। তার ভিতর দিয়ে সোজা উত্তর মুখো হাঁটলেই যাওয়া যাবে ভিজিটরস্ সেন্টারের দিকে। তার মানে এখন তাঁরা এসে গেছেন সেই জলার পাশের মাঠের ধারে।

দেখা যাবে কাল সকালে। এখন তো গাছে উঠে বসা যাক। এ গাছটা পঞ্চাশ ষাট ফুট উঁচু হবে।

'কী দীপ, চড়তে পারবে তো? রিতি, তুমি কী বলো?'

বিজ্ঞের মতো উত্তর দেয় রিতি, 'চড়তে তো হবেই, ভেবে লাভ কী? দেখুন, দীপ পারবে কিনা। ওর তো আবার মাথা ঘোরে।'

'যা যা, বাজে বকিস না' দীপের আত্মমর্যাদায় লাগে, 'মাথা ঘোরে না মোটেই। পারবো কাকু।' বলেই তরতর করে সে গাছ বেয়ে উঠতে থাকে। রিতি ওঠে পিছন পিছন। অজিত সব শেষে।

প্রায় তিরিশ ফুট উপরে দুটো মোটা ডালের সংযোগস্থলে প্রশস্ত জায়গা। সেখানে উঠে সামনের দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে রিতি। কিছুটা দূরে আকাশের গায়ে, দেখা যাচ্ছে লম্বা গলা দু'তিনটে জানোয়ার।

'দেখো, দেখো, আবার কতগুলো দৈত্য।'

'দৈত্য নয়,' অজিত বলেন, 'ওরা নেহাতই নিরীহ জীব। কী দীপ, কী ধরনের ডাইনোসর ওরা বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, পারি। ওরা ব্র্যাকিওসর।'

'সহ্য করতে পারি না বাবা,' রিতি বলে, 'রাক্ষসের দল যত!'

'না, ওরা রাক্ষসটাক্ষস নয়, আর পাঁচটা প্রাণীর মতোই ওরাও সাধারণ প্রাণী।'

'টিরানোসরাসও সাধারণ প্রাণী?'

'প্রাণী তো বটেই, যদিও সাধারণও নয়, নিরীহও নয়। তুমি টি-রেকসের উপরে রাগ করছো—তা রাগ করারই কথা—তবে কী জানো, ও যা করছে তা ওর হিসেব মতো অন্যায় নয়। আমরা ওর কাছে খাদ্য, ওর কী দোষ বলো? জৈবিক প্রয়োজন তো ওরও মেটাতে হবে। আমরাই বরং এই আধুনিক জগতে ওকে হাজির করে অন্যায় করেছি।'

'জানি না বাপু', রিতি আবার গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমাকে খেতে না এলেই হল।'

'খাবে না রে,' দীপ রিতিকে খোঁচায়, 'তুই নিশ্চয় খুব বিচ্ছিরি খেতে হবি। ওর পেট কামড়াবে।'

রিতি মারতে যায় দীপকে। অজিত হাসেন। ছোটদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কত বেশি। কে বলবে এইমাত্র ওরা প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে এসেছে। হঠাৎ অজিতের ইচ্ছে হয় একটা মজা করার। হাত মুঠো করে শিঙা ফোঁকার ভঙ্গিতে ব্র্যাকিওসরাসের ডাক অনুকরণ করে শব্দ করেন তিনি। তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ডেকে ওঠে দূরের ব্র্যাকিওসরাসগুলো। মুখ ঘোরায় এদিকে। তাঁদের আরও অবাক করে দিয়ে খুব কাছে পর পর গলা সোজা করে মুখ ঘোরায় আরও দুটো ব্র্যাকিওসরাস। এতক্ষণ নিশ্চয় মাথা নিচু করে গাছপালা খাচ্ছিল। তাই? নাকি ঘুমোচ্ছিল? কে জানে!

সকলে তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। অজিত বলেন, 'এরা কিন্তু আমাদের গরুদের মতোই নিরীহ। দেখতেই যা এত বড়!'

এবারে গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে বসেন অজিত। দু'টি শিশু পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাঁর কাঁধে মাথা রাখে। অজিত তাদের দু'হাতে জড়িয়ে ধরেন। আরও একটু নেমে বসতে যেতেই কিসে অজিতের যেন একটা খোঁচা লাগে। পিছনের পকেটে হাত দিয়ে দেখেন,

সেই ভেলোসির্যাপটরের নখটা রয়েছে। বার করে নিয়ে সেটাকে দেখেন অজিত।

'আচ্ছা কাকু', দীপ জিজ্ঞেস করে, 'এই এখানকার ডাইনোসরদের কী হবে এবার?'

'কী আর হবে। বিবর্তিত হয়ে কোথাও একটা পৌঁছবে কালক্রমে।'

'আজ থেকে কুড়ি কোটি বছর পরে কী হবে?'

'বলা কি যায়? তবে মানুষ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে মনে হয় আমাদের বদলে এই ডাইনোসরদেরই কোনো জাতভাই হয়তো তখন রাজত্ব করবে!'

'মানুষ কী ভাবে এগোচ্ছে?'

'এই যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ করছে, মারামারি কাটাকাটি করছে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে মরছে, পৃথিবীটাকে ক্রমশ নানা রকম দূষিত পদার্থ ছড়িয়ে বাসের অযোগ্য করে ফেলছে।'

রিতি গম্ভীর হয়ে বলে, 'না কাকু, সব মানুষ কি আর ওরকম? দেখবে, এরকম থাকবে না, সবাই ভালো হয়ে যাবে।'

অজিত হাসেন। বলেন, 'ঠিকই বলেছো। তাই যেন হয়।'

ডালের উপর এক পাশে ছ'ইঞ্চি লম্বা নখটা রাখেন অজিত। পকেটে রাখলে বসা যাবে না। রিতি আর দীপের চোখ বুজে আসছে ঘুমে। ক্লান্তিতে অজিতের শরীর আর চলছে না।

'কাকু', ঘুমজড়িত কণ্ঠে রিতি বলে, 'টি-রেকস্ আর আসবে না তো?'

'না, আসবে না।'

'আমরা ঘুমিয়ে পড়লে অন্য কোনো ডাইনোসর যদি আসে?'

'আমি জেগে থাকবো।'

'সারা রাত্তির?'

'হ্যাঁ, সারা রাত্তির।'

'ঠিক বলছো?'

'একদম ঠিক।'

দুই শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। বসে বসে নরম গলায় ব্র্যাকিওসরাসদের নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি শোনেন অজিত। খেয়ালও করেন না কখন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গি ভেলোসির্যাপটরের নখ ডাল থেকে

নিচে পড়ে যায়।

'আমার ছোটবেলা কেটেছে ঘাটশীলার আশেপাশে,' ভবতারণ বলেন, 'জানেন মিসেস বোস। তখন বেশ ঘন জঙ্গল ছিল। মনে আছে যদুগোড়ার পাহাড়ে চিতাবাঘের অভাব ছিল না। তখন সুবর্ণরেখার উপরে ব্রীজ হয়নি। একটা "কজওয়ে" ছিল, তার উপর দিয়ে জল বাড়লে খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে যেতে হত। অন্য সময়ে "কজওয়ে"র তলা দিয়ে তোড়ে জল যেত আর আমরা গামছা পেতে মাছ ধরতাম। দুপুরবেলা নদীর পাড়ে ঘুরে ঘুরে দেখতাম, বালি ছেলে সোনা বার করার চেষ্টা চলছে। সেই সোনা দেখতে দেখতে, আর কখনও জামশেদপুরে গেলে জামশেদজী টাটার উদাহরণ ভাবতে ভাবতে মনে করতাম কবে আমিও ওই রকম বড়লোক হবো। অবশ্য আমার বাবা খুব সামান্য চাকুরে ছিলেন, টাকা হবে অনেক এমন সম্ভাবনার কথা ভাবাই যেত না। বাবা ভাবতেন, তাঁরই মতো কেরানি হবে তাঁর ছেলে ওই তামার কারখানায়। তবে বাবার কাছেই আমি জঙ্গল ভালোবাসতে শিখেছি। বাবা খুব বিভূতিভূষণের ভক্ত ছিলেন। আমাকে "আরণ্যক" বইটা পড়ে শোনাতেন। আমার মা আমাকে বলতেন, বাড়ি ছেড়ে পালাসনে যেন। শেষে মায়ের কথাই ফলে গেল। স্কুল শেষ হতেই কেটে পড়লাম। অনেক ঘাটের জল খেলাম। এক সময়ে ভাগ্য খুলে গেল অ্যামেরিকাতে।'

রেস্তরাঁতে বসে খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। রায়া শুনছিলেন ভবতারণের গল্প আর ভাবছিলেন, লোকটা কি হৃদয়হীন নাকি? তারপরেই মনে হল তা নয়, এইসব বলে বৃদ্ধ দুশ্চিন্তা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

একটু আগে জিপ নিয়ে ফিরেছেন তাঁরা। চোখ বুজলেই রায়া দেখতে পাচ্ছেন টিরানোসরাসের ছুরির মতো দাঁতের সারি। এখনও কানে বাজছে তার ভয়াবহ গর্জন। রাকেশকে শুইয়ে রেখেছেন কনট্রোল রুমে। ওঁর ডান পায়ের তিন চারটে জায়গা ভেঙে গেছে। সারা গায়ে অজস্র ক্ষত। টিরানোসরাস ওঁকে যখন ধাক্কা মারে

তখন তার দাঁতের খোঁচায় বাঁ পায়ের জানুতে প্রায় এক ফুট দীর্ঘ দু'ইঞ্চি গভীর একটা ক্ষত হয়ে গেছে। এক্ষুনি চিকিৎসা দরকার। ডাইনোসর পার্কে ডাক্তার বলতে কেবল আছেন ডাঃ কর। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বস্তুত ন্যাট আর অ্যালান ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। হয় তাঁরা সকলে কোথাও লুকিয়ে আছেন, নয়তো বেঁচে নেই। এই রাত্তিরে কাউকে খোঁজাও যাবে না। টেলিফোন, ভিডিও, সবই তো অকেজো হয়ে আছে।

অ্যালান কোনো রকমে প্রাথমিক চিকিৎসা করেছেন। একটা মরফিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন রাকেশকে। ন্যাট নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছেন কমপিউটার ব্যবস্থাকে আবার চালু করতে।

'একটা মজার কথা বলি, মিসেস বোস, ছোট বেলায় ডিমনা লেকের ধারে দাঁড়িয়ে ভাবতাম, বড় হয়ে একটা দ্বীপ কিনবো। সেখানে একটা আশ্চর্য জগত বানাবো। রূপকথার জগত। তখনও অবশ্য ডাইনোসর ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। সেটা প্রথম মনে হয় স্কটল্যাণ্ডে লক নেস মনস্টার দেখতে গিয়ে। সাত দিন বসেছিলাম লেকের পাড়ে। পঞ্চম দিন ভোরবেলা কী যেন একটা দেখেছিলাম কুয়াশার মধ্যে। সেটা "নেসি" ছিল কিনা জানি না। তখন থেকে ডাইনোসর সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করি। মাথার মধ্যে ডাইনোসর পার্কের পরিকল্পনা দানা বাঁধতে থাকে। তারপর একদিন কাজটা করে ফেলি। রিকম্বিনান্ট ডিএনএ টেকনোলজি আবিষ্কারের দিন থেকেই লেগে আছি আমি।'

'না লেগে থাকলেই ভালো হত', বলেন রায়া।

'কী বলছেন, মিসেস বোস। ভালো হত? ডাইনোসর পার্ক কোথায় পেতেন তাহলে? ডাইনোসরদের দেখতে পেতেন?'

'দেখতে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক হত বৈকি। আপনি যা এখানে করেছেন সেটাই অস্বাভাবিক।'

'আমি আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছি মাত্র।'

'আপনার ক্ষমতা নয়, প্রকৃতির শক্তি। বিজ্ঞানের শক্তি। আর সেই শক্তির অপব্যবহার করেছেন আপনি,' রায়া আর সামলাতে পারেন না নিজেকে। 'রাকেশ ঠিকই বলেছিল। আপনি বিজ্ঞানকে কিনেছেন, তাকে অর্জন করেননি। বিজ্ঞানের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রয়োগের

ফলে যে বাঁধনহারা শক্তি আপনি এখানে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তার ফলাফলের কথা ভাবেননি আপনি।'

'আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন, মিসেস বোস। পরের বার—'

'আপনি এখনও বুঝছেন না কী করেছেন আপনি? প্রকৃতির শক্তির প্রতি কোনো শ্রদ্ধা আপনি প্রদর্শন করেননি, বরং ভেবেছেন প্রকৃতি হবে আপনার ক্রীতদাস। আপনারা পয়সাওয়ালা লোকেরা সব কিনে নিতে চান। আজ বিত্তবান দেশগুলো আইন করে জীবনের উপরেও একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে চাইছে। সেই সব আইন জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছে গরিব দেশগুলোর উপরে। আপনিও সেই দলে। টাকা দিয়ে সব হয় না ভবতারণবাবু।' একটু থেমে আবার বলেন রায়া, 'যন্ত্রের উপর নির্ভর করে ভেবেছেন প্রকৃতিকে বেঁধে রাখবেন—'

'হ্যাঁ, সেটাই আমার ভুল হয়েছে। বড্ড বেশি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছিলাম আমি। এবার সব ব্যবস্থা পালটে দেবো। এরকম তো হত না যদি না ওই সুবোধটা গোলমাল পাকাত। ওকে একবার পেলে—'

'মনে হয় না ওকে আর পাবেন। এতক্ষণে ও আর বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। নিজের বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম শিকার হয়তো ও নিজেই।'

'একটা ছোট্ট গোলমাল—'

'না, ভবতারণবাবু, ছোট্ট গোলমালটা উপলক্ষ্যমাত্র। এরকম হতই। আপনার অবিমৃশ্যকারিতার ফলে আজ এত লোক মরছে। ওই পার্কের জঙ্গলে আজ বিভীষিকার রাজত্ব। আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না। বুঝবেনও না। আপনার মেগালোম্যানিয়ার ফলে আজ আপনারই নাতি-নাতনি কোথায় হারিয়ে গেছে জঙ্গলে, কোথায় আছে অজিত এখন কে জানে!'

ভোর হতে আর খুব বাকি নেই। ইতিমধ্যেই পুব দিকের আকাশের কালিমা ফিকে হয়ে এসেছে। অজিত সত্যিই জেগে থেকেছেন সারা রাত। এই রাতের কথা সারা জীবন মনে থাকবে তাঁর।

ঘুমন্ত রিতি আর দীপকে দু'হাতে আগলে রেখে সমস্তক্ষণ অজিত ভেবেছেন রায়ার কথা। আশা করি ও নিরাপদে আছে। ডাইনোসর পার্কের কতটা অঞ্চল জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহে গণ্ডগোল হয়েছে কে জানে! নিশ্চয় দ্বীপের বিভিন্ন অংশের শক্তি সরবরাহ স্বতন্ত্র। এমন হলই বা কী করে? এটাই সবচেয়ে রহস্যময় মনে হয় অজিতের।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক অজিত সামনের দিকে লক্ষ রাখতে ভুলে গেছেন কয়েক মিনিট। আচমকা পায়ের উপর গরম বাতাস লাগতে তাঁর মনোযোগ ফিরল এক ধাক্কায়। ধড়মড়িয়ে উঠল দুই ভাই-বোনও। সামনে, মাত্র কয়েক হাত দূরে, যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা দেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রিতি।

বিরাট একটা মাথা। চওড়ায় অন্তত তিন ফুট। হাঁসের মতো ঠোঁটদুটো একান থেকে ওকান পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে হাঁসের মতো চ্যাপ্টা আর চওড়া নয়। চোখের উপরে ভুরুর মতো একটা হাড়ের শিরা। বড় বড় দুটো চোখে পরম নিরীহ অভিব্যক্তি। গরুর চোখের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। লম্বা গলার উপরে সেই মুখ খুব ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। তারই নিঃশ্বাস এসে লেগেছে পায়ে।

প্রাণীটার মুখের ভাব দেখে রিতিও বুঝেছে এর কাছ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। দীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এটা ব্র্যাকিওসরাস, না কাকু?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।' উঠে দাঁড়িয়ে অজিত পাতাওয়ালা একটা ছোট ডাল ছিঁড়ে নিলেন। বাড়িয়ে ধরলেন ব্র্যাকিওসরাসের দিকে। মুখটা একটু পিছিয়ে, গলার ভিতরে নরম একটা শব্দ করে ডালটা থেকে পাতা খেতে শুরু করল বিশাল তৃণভোজী। তার চোয়ালের নড়াচড়া দেখেও গরুর জাবর কাটার কথা মনে পড়ে যেতে লাগলো অজিতের। কী আশ্চর্য, তাই না, ভাবলেন অজিত, কোটি কোটি বছরেও তৃণভোজীদের স্বভাব বদলায়নি।

দীপের এতক্ষণে সাহস হয়েছে। এগিয়ে এসে সে হাত বোলাতে লাগল ব্র্যাকিওসরাসের উপরের ঠোঁটে। রিতির মুখেও হাসি ফুটেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই, কেন কে জানে, হাত বোলানো ব্র্যাকিওসরাসের পছন্দ হল না। ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা অনেকটা পিছিয়ে নিল সে।

হাত বোলাবার সুযোগ না পেয়ে হতাশ রিতি বলে উঠল, 'আয়, আয়, ব্র্যাকি আয়।'

তার উত্তরেই যেন, মাথা পিছনে হেলিয়ে, 'হ্যাঁচ্চো' করে প্রচণ্ড এক হাঁচি দিল ব্র্যাকিওসরাস। সঙ্গে সঙ্গে তার নাক কান থেকে এক রাশ জল ছিটকে গিয়ে রিতিকে একেবারে স্নান করিয়ে দিল। মুখচোখ বিকৃত করে রিতি ভীষণ চটে উঠল। হো হো করে হেসে দীপ ব্র্যাকিওসরাসকে বলল, 'বেঁচে থাকো।'

'ও আবার কী ঢং? বেঁচে থাকো বলছিস কেন?' রিতি রেগে কাঁই।

'আরে, শুনিসনি, ঠাকুমা দিদিমারা কেউ হাঁচলেই বলেন "বেঁচে থাকো"। তাই বললাম আর কি।'

একটু পরেই সকাল হয়। সূর্য উঠতেই গাছ থেকে নেমে পড়েন অজিত। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ফিরতে হবে। ঘুমপাড়ানি বন্দুক নিয়ে অ্যালানকে পাঠাতে হবে। ততক্ষণে টি-রেকস্ পার্কের কতগুলি জানোয়ার মেরে ফেলবে কে জানে। অবশ্য একটা ব্র্যাকিওসরাস মারলেই ওকে দিনকতকের জন্যে আর শিকার করতে হবে না। ওই নিরীহ একটা জীব টিরানোসরাসের কবলে, ভাবতেই কষ্ট হয় অজিতের।

জঙ্গল থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছেন তিন জন। বড় গাছের জঙ্গল শেষ হয়ে এসেছে। খোলা মাঠ শুরু হচ্ছে। সামনে দেখা যাচ্ছে জমিটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। সেদিকে চললেন অজিত। সামনে একটা বড় গাছ। তার শিকড় ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। ছেলে মেয়ে দুটো লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে গেল সেগুলি। কী আশ্চর্য ওদের প্রাণশক্তি। সারা রাত হিমের মধ্যে বসে থাকা, তার আগে বৃষ্টিতে ভেজা আর ওই রকম ধকল। অজিতের তো শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। অথচ ওরা দেখ, কেমন লাফাতে লাফাতে চলেছে।

খুব উঁচু একটা শিকড় ডিঙিয়ে একটা ঘেরা জায়গায় পা দিয়েই অবাক হয়ে গেলেন অজিত। জায়গাটা জুড়ে পড়ে আছে ডাইনোসরের ডিমের বেশ কয়েকটা খোলা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে চলে গেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে তিন-আঙুলে পায়ের ছাপও

দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য! এখানে এল কী করে ডাইনোসরের ডিম?

দীপ আর রিতি খানিক এগিয়ে আবার ফিরে এসেছে। 'কী এগুলো কাকু?'

'ডাইনোসরের ডিম। কিন্তু এখানে ওদের সব তো মেয়ে, তাহলে ডিম এলো কী করে?'

একটু ভাবতেই উত্তরটা ধরা গেল। এটা তো জানাই আছে যে কিছু পতঙ্গের স্ত্রীজাতীয়রা নিজেরাই সন্তানের জন্ম দিতে পারে পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন ছাড়াই। নাম করা যায় অ্যাফিডদের। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'পার্থেনোজেনেসিস।' এছাড়া, বর্তমান ক্ষেত্রে আছে আবার সেই ব্যাঙের ডিএনএর ব্যাপার। ব্যাঙের মানেই তো উভচরের ডিএনএ। এ ব্যাপারটা কিছু ব্যাঙেদের মধ্যে দেখা গেছে। দেখা গেছে, কয়েক রকম গাছপালা এবং প্রাণী লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে। যেমন, কয়েক জাতের অরকিড, কিছু মাছ আর চিংড়ি। তার সঙ্গে ব্যাঙ। ডিম পাড়তে দেখা গেছে এমন কিছু ব্যাঙ তাদের জীবদ্দশাতেই সম্পূর্ণ পুরুষ হয়ে গেছে। প্রথমে পুরুষের মতো লড়াই-এর ভঙ্গি করতে শুরু করেছে, তার পরে প্রজননের সময়ে পুরুষ ব্যাঙের মতো শীষ দিতে আরম্ভ করেছে। তারও পরে তাদের শরীরে পুরুষালি হরমোন দেখা দিয়েছে, পুরুষের মতো যৌনাঙ্গ গজিয়েছে। শেষে মেয়ে ব্যাঙের সঙ্গে সফল যৌন মিলনেও লিপ্ত হয়েছে তারা। এমন হয়েছে সেই সব পরিস্থিতিতে যেখানে সব ক'টা প্রাণীই একই লিঙ্গের। এধরনের অবস্থায় কিছু কিছু উভচর প্রাণী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই লিঙ্গ পরিবর্তন করে স্ত্রী থেকে পুরুষে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখানেও তাই ঘটেছে। কিছু ডাইনোসর স্ত্রী থেকে পুরুষ হয়ে গেছে। জীবনকে বেঁধে রাখা যায়নি। নিয়ন্ত্রণের বন্ধন ছিন্ন করে নিজের প্রসারের পথ করে নিয়েছে সে।

এতক্ষণে বোঝা গেল, কমপিউটারের হিসাবে গোলমাল হচ্ছিল কেন, কেন কোনো কোনো প্রজাতি সংখ্যায় বেড়ে গেছে।

গ্যালিমাইমাসের মৃত্যু

রাকেশ এখনও অজ্ঞান হয়ে আছেন। মরফিনের প্রভাব কাটেনি। কনট্রোল রুমে আলো জ্বলছে আপৎকালীন অতিরিক্ত জেনারেটরের সাহায্যে। এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ওখান থেকে শক্তি নিচ্ছে, তাই দরজাগুলো এখনও বৈদ্যুতিন ব্যবস্থাতেই আটকানো আছে।

সকলের মনেই চিন্তা ছিল ভেলোসির্যাপটরগুলিকে নিয়ে। প্রাণী জগতে এদের চেয়ে হিংস্রতর শ্বাপদ কখনও দেখা যায়নি নিঃসন্দেহে। অ্যালান লক্ষ করে দেখেছিলেন, অন্যান্য মাংসাশীদের সঙ্গে এদের অনেক অমিল। এরা খিদে না থাকলেও অন্য প্রাণী হত্যা করে আনন্দ পায়। অন্যান্য ডাইনোসরদের চাইতে এরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান। হাতি বা বানরদের মতো এরা দরজা খুলে ফেলতে পারে, ফলে এদের পালাবার সম্ভাবনা বেশি। হাতলও ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলতে পারে এই র‍্যাপটররা। ঠিক শিম্পাঞ্জিদের মতো। এদের হাতের আঙুলগুলো খুব পটু এসব কাজে। এত সব ঠিক মতো বোঝা যায়নি প্রথম দিকে। ফলে একবার একটা র‍্যাপটর বেরিয়ে পড়েছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'জন রাজমিস্ত্রিকে মেরে ফেলে তাদের মাংস ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছিল। আজও অ্যালান সেই দু'জন হতভাগ্যের করুণ চিৎকার শুনতে পান,

দেখতে পান র‍্যাপটরের ছ'ইঞ্চি লম্বা পিছনের পায়ের নখে ছিন্নভিন্ন তাদের নাড়িভূঁড়ি। সব ডাইনোসরকে অ্যালান সহ্য করতে পারেন, তাদের হিংস্রতারও অর্থ বোঝেন। কিন্তু এই ভেলোসির‍্যাপটরদের সম্পর্কে তাঁর মনে আছে ভীতিমিশ্রিত ঘৃণা। তিনি মনে করেন, এক মুহূর্তও এদের বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভবতারণের মত আলাদা। তাঁর মতে, এরাই ডাইনোসর পার্কের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবে।

তবে সাবধানতার প্রয়োজন ভবতারণও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই র‍্যাপটরদের এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কিছু অতিরিক্ত ধাপ ছিল। শক্তি সরবরাহ বিঘ্নিত হলেও, বেড়াতে বিদ্যুৎসঞ্চালন বন্ধ হবে না, সঙ্গে সঙ্গে আপৎকালীন জেনারেটর থেকে শক্তি চলে যাবে সেখানেও। তাছাড়া, হোটেলের সমস্ত জানলা দরজা মোটা বিশেষ ইস্পাতের গরাদ দিয়ে জোরদার করা হয়েছিল। কনট্রোল রুমের দরজাগুলো কমপিউটারই চালায়। পার্কের অন্যান্য দরজাও তাই, তবে এখানকার ব্যবস্থাটা আলাদা। সুবোধের তৈরি প্রোগ্রাম তাই এখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেনি। র‍্যাপটররাও ছাড়া পায়নি।

কিন্তু এবার কী হবে? ন্যাট যা বলছেন তাতে সকলেই গভীর চিন্তায় পড়েছেন। সুবোধের চক্রান্ত অতিক্রম করে গোটা পার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আবার চালু করতে হলে পুরো কমপিউটার বন্ধ করে দিতে হবে। তাহলে জুড়ে দেওয়া প্রোগ্রাম মুছে যাবে। তারপরে আবার কমপিউটার চালু করলে মূল প্রোগ্রাম কার্যকরী হবে এবং সব কিছু পুনরায় সচল হবে। তবে যেটুকু সময় কমপিউটার বন্ধ থাকবে সেই সময় ভেলোসির‍্যাপটররা বৈদ্যুতিক পাহারা থেকে মুক্ত থাকবে। সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যাবে।

অথচ তা না করেই বা উপায় কী? কী করে তা নাহলে ডাইনোসর পার্ককে আবার নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে? ডাইনোসরগুলোকে আবার বন্দি করা যাবে কেমন করে?

'আচ্ছা, আমরা তো চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করলেও পারি', বলেন অ্যালান।

'ততক্ষণে তো সব ক'টা প্রাণীই মরে যাবে।'

'কী করে?' রায়া জানতে চান।

'প্রাণীগুলো যাতে কোনোদিন মুক্ত হয়ে বাইরের জগতে টিঁকে না থাকতে পারে তার একটা ব্যবস্থা আছে।' ব্যাখ্যা করেন ন্যাট। 'ওদের তৈরি করার সময় ওদের শরীরে একটা খুঁত রেখে দেওয়া হয়েছে। ওরা নিজেরা শরীরের মধ্যে লাইসিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা উৎপাদন করতে পারে না। লাইসিন ছাড়া কোনো প্রাণী বাঁচে না। প্রত্যেক দিন ওদের লাইসিন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে। সেটা না খাওয়ালে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ওরা সব মরে যাবে।'

'না, কিছুতেই না,' ভবতারণ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কমপিউটার পুরো বন্ধ করে আবার চালু করব। কতক্ষণই বা লাগবে। ওটুকু সময়ের মধ্যে কিছু হবে না। আমার ডাইনোসর পার্ক এভাবে নষ্ট হতে দেব না। ন্যাট, আপনি কমপিউটার বন্ধ করে দিন।'

'কিন্তু মিঃ চক্রবর্তী, আমরা কখনও কমপিউটার পুরো বন্ধ করিনি। কী হবে বলি কী করে!'

'বলার কিছু নেই। বন্ধ করুন।'

'আমি আগেই বলেছিলাম', রাকেশের দুর্বল গলা শোনা যায়, তাঁর জ্ঞান ফিরেছে, 'এই জটিল ব্যবস্থায় গোলমাল হতে বাধ্য।'

ভবতারণ উত্তর দেন না। ন্যাটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আবার বলেন, 'ন্যাট, এটা আমার আদেশ, কমপিউটার বন্ধ করুন।'

'বেশ', ন্যাট বলেন, 'বন্ধ করছি, কিন্তু কাজটা ভালো হচ্ছে না।'

একটা একটা করে সুইচ বন্ধ করতে শুরু করলেন ন্যাট। এক এক করে কমপিউটারের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। যে ক'টা টিভি পর্দা, মনিটর চালু ছিল এবারে অন্ধকার হয়ে গেল। সমস্ত নির্দেশক পর্দা, সমস্ত যন্ত্র বিকল হয়ে গেল। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের গুঞ্জন থেমে গেল, বিচিত্র একটা নীরবতা নামল ঘরটাতে। শেষ সুইচটা বন্ধ করতেই সমস্ত আলো নিভে গেল। চারদিক হয়ে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আগে থেকে বার করে রাখা টর্চগুলো জ্বালালেন সকলে।

ন্যাট বললেন, 'আবার চালু করছি প্রধান সুইচ। দেখা যাক কী হয়।' খট করে সুইচটা টিপলেন ন্যাট। কমপিউটারের প্রধান কনসোলের পর্দার এক কোণে লেখা ফুটে উঠল—সিস্টেম রেডি।

কিন্তু কোথায় কী? কোনো কিছুই নতুন করে চালু হল না। অন্ধকার যেমন ছিল তেমনই রইল। নীরবতা ভাঙল না।

সকলে চুপ! কী হল? মূল প্রোগাম কার্যকরী হচ্ছে না কেন? কোনো গোলমাল হল কি?

নীরবতা ভেঙে ন্যাট বললেন, 'বুঝেছি। এখন হাতে করে প্রধান সুইচিং রুমে সব ক'টা ব্যবস্থা সচল করার সুইচগুলো আলাদা আলাদা করে চালু করতে হবে।'

'ঘরটা কোথায়?' রায়া জিজ্ঞাসা করেন।

'এই বাড়িটার উত্তরে, মাটির নিচে।'

'আমি যাবো?'

'আপনি গেলে হবে না। এতো আর রান্নাঘরের আলো জ্বালানো নয়। কোনটার পরে কোনটা টিপতে হয় তার একটা ছক আছে। সেটা আমি জানি। আপনারা হোটেলের নিচের ঘরে চলে যান, অস্ত্রশালায় সকলে নিরাপদে থাকবেন। আমি আসছি।' ন্যাট বেরিয়ে গেলেন।

ঘন জঙ্গল পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে এসেছেন অজিত। রিতি আর দীপ লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। সকালের রোদ্দুর ভারি চমৎকার লাগছে। রাত্রের বৃষ্টির পর গাছপালা যেন আরও সবুজ হয়েছে। সামনে একটু উঁচু জমি। তারই উপরে উঠছেন তিন জনে। উপরে উঠে দেখা গেল খোলা মাঠ। মাঝে মাঝে কয়েকটা গাছ। দূরে আবার পাহাড় উঠেছে। খানিকটা দূরে ডানদিকে কয়েকটা গাছের ছোট একটা বন।

একদল ধাবমান পশুর পায়ের শব্দে সকলে সে দিকে তাকালেন। বনের আড়াল থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল একদল জীব। চলেছে অজিতের ডান দিক থেকে বাঁদিকে।

চেহারা মূলত অন্য সব ডাইনোসরদের মতোই। একই রকম

লেজ, একই রকম শক্তিশালী পিছনের পা। সামনের পা ভাঁজ করে বুকের কাছে জড়ো করে রাখা, লম্বা গলা। মাথাটা পাখির মতো। গলা আর বুকের কাছটা সাদাটে, পিঠের দিকটা বাদামি। অনেকটা ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়চ্ছে। অবশ্য জোড়া পায়ে লাফাচ্ছে না, আগে পরে পা ফেলেই ছুটছে জীবগুলো।

অন্য সময় হলে খুবই অবাক হতেন অজিত। এখন ডাইনোসর দেখাটা তাঁর কাছে জল ভাত হয়ে গেছে। দীপকে বললেন, 'বলো তো দীপ, এরা কারা?'

'এরা, এরা, এরা গ্যালিমাইমাস।'

'ঠিক বলেছো। কিন্তু দেখো, দেখো, ওরা কেমন দিক পরিবর্তন করলো, ঠিক যেন এক ঝাঁক পাখি, সামনে কোনো বিপদ বুঝে দিক পালটে অন্য পথে চলতে শুরু করছে।'

গ্যালিমাইমাসের দলটা হঠাৎ ঘুরে অজিতদের টিলার দিকেই আসছে। বেশ বড় দল। অজিতের মনে পড়ল, হিসাবে দেখেছিলেন পঁচিশটা। লম্বায় এক একটা দশ ফুট তো হবেই। ওজনেও কম হবে না।

দীপ আর রিতি বলে, 'পালাও, কাকু, ওরা এদিকেই আসছে।' বলেই ছুট দেয় পিছন ফিরে।

সম্বিত ফেরে অজিতের। পায়ের শব্দে মাটি কাঁপছে। দেখতে দেখতে টিলার মাথায় উঠে আসে দলটা। পায়ের তলায় পড়লে আর রক্ষা নেই। ভয় পেয়ে ছুটছে ওরা, দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। অজিতও ছুটলেন, দীপ আর রিতির হাত ধরে, পাঁই পাঁই করে। দেখতে না দেখতে প্রথম গ্যালিমাইমাসটা ওঁদের ছাড়িয়ে চলে গেল। বাকি দলটাও এসে পড়েছে। মাটি কাঁপছে, ধুলো উড়ছে। পাখির মতোই কিচমিচ করে ডাকছে জীবগুলো।

সামনে পড়ে আছে একটা মরা গাছের গুঁড়ি। কোনো রকমে হাঁচোড় পাঁচোড় করে তিন জনে সেটা টপকে তার তলায় বসে পড়লেন যতটা সম্ভব নিজেদের গুটিয়ে ছোট করে। মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল গ্যালিমাইমাসের দল। আলাদা করে একটাকেও ভালো দেখা যাচ্ছে না। লেজ, পা, মাথা, পিঠ, গতির মুখে সব একাকার।

শেষ প্রাণীটা পার হয়ে যেতেই অজিত তাড়াতাড়ি রিতি-দীপকে গুঁড়ির তলা দিয়ে ওপাশে আড়ালে নিয়ে গেলেন। নিশ্চয় দলটাকে তাড়া করে কোনো শিকারী মাংসাশী আসছে।

গুঁড়ির পিছনে লুকিয়ে সবে তিনজনে মাথা তুলে দেখছেন, ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে গ্যালিমাইমাসরা, বিকট গর্জন করে আবির্ভূত হল টিরানোসরাস। প্রায় চল্লিশ ফুট দীর্ঘ বিরাট দেহ বাঁকিয়ে মুখ নিচু করে অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ছোঁ মারলো একটা গ্যালিমাইমাসের দিকে। ফসকে গেল। ঠিক পিছনের গ্যালিমাইমাসটা হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই খপ করে তাকে ধরে ফেলল টি-রেকস্। সাড়ে তিন ফুট দীর্ঘ অসীম শক্তিশালী চোয়ালের জাঁতাকলে আটকা অসহায় আর্তনাদরত প্রাণীটাকে দু'তিনটি ঝটকায় মেরে ফেলল, তারপরে গলা দিয়ে ভয়াবহ শব্দ করতে করতে ছিঁড়ে খেতে লাগল ওখানেই।

'চুপ, চুপ, কোনো শব্দ করো না, আস্তে আস্তে চলে এসো,' বলে অজিত রিতির হাত ধরে টানলেন। দীপ তখন ওই দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। ভয়ও করছে অথচ বিচিত্র এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি তাকে টেনে রাখছে। ওসব করলে চলবে না, অজিত দীপকে প্রায় বগলদাবা করে রওনা দিলেন। আবার অনেকটা ঘুরে যেতে হবে।

কিন্তু যাবেন কোন দিক দিয়ে? চারদিক খোলা। লুকোবার জায়গা নেই। মাঠটা পেরোতে গেলেই টি-রেকসের চোখে পড়তে হবে। অবশ্য এখন সে খাওয়ায় ব্যস্ত। তবু বলা যায় না। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না অজিত।

সমাধান করে দিল টি-রেকস্ নিজেই। গ্যালিমাইমাসের দেহের বেশ খানিকটা খেয়ে হঠাৎ মাথা তুলে এদিক ওদিক দেখতে লাগল সে। ঠিক যেন ভাবছে, এখানে খোলা জায়গায় কেউ আবার এসে খাবারে ভাগ বসাবে না তো! তার শিকার ছিনিয়ে নিতে পারে এমন কোনো প্রাণী এই দ্বীপে কেন, সারা পৃথিবীতেও যে নেই, তা তো আর টিরানোসরাস জানে না। তার জৈবিক বোধ তাকে এমন সতর্ক হতে শিখিয়েছে। কে জানে, তার জাতভাই তো এসে পড়তে পারে একটা।

আকাশের দিকে মুখ তুলে অদৃশ্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় দেখিয়ে একটা হুংকার ছাড়লো টিরানোসরাস। তারপর, শিকার মুখে তুলে নিয়ে চলে গেল একটা গাছের আড়ালে। নীরবে গুঁড়িটার পিছনে বসে রইলেন অজিত, রিতি আর দীপ।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। গাছটার আড়াল থেকে মাংস ছেঁড়ার শব্দ আসছে। আসছে বুক কাঁপানো গজরানি। খানিক বাদে সেই শব্দ থেমে গেল। শোনা যেতে লাগল কেবল টি-রেকসের নিঃশ্বাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ।

অদ্ভুত লাগছে। বসেই বা থাকা যাবে কতক্ষণ। রিতি আর দীপকে চুপচাপ বসে থাকতে বলে গুঁড়িটার পিছন থেকে এবারে বেরিয়ে এলেন অজিত। দেখতে চেষ্টা করলেন কী করছে টি-রেকস্। যা দেখলেন তাতে হাসিও পেল, খানিকটা নিশ্চিন্তও হওয়া গেল। টিরানোসরাস ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকিয়ে। গাছের ছায়ায় সোজা হয়ে বসে পিছনের পা ছড়িয়ে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে ছ'ফুট লম্বা মাথাটা উঠছে নামছে। চোখ খোলা। রক্তাক্ত চোয়াল ঝুলে পড়েছে। তার রক্ত মাখা দাঁতের উপরে, সারা মুখে, আর গ্যালিমাইমাসের আধখাওয়া দাপনার উপরে ভন ভন করছে মাছির ঝাঁক। একবার ঘুমের মধ্যেই সামনের ক্ষুদে হাত তুলে মাছি তাড়াবার চেষ্টা করল দানব। তারপর একটু নড়ে উঠল।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অজিত। এই খোলা মাঠে টি-রেকস্ যদি ধাওয়া করে তাহলে আর রক্ষা নেই। দৌড়ে টি-রেকসকে দীপ আর রিতির কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হবে, ঠিক করলেন অজিত।

কিন্তু না। তা করতে হল না। নড়েচড়ে আরও জমিয়ে বসে বিকট শব্দে একটা ঢেকুর তুলে আবার গভীর ঘুমে ডুবে গেল টিরানোসরাস রেকস্।

ইশারায় রিতি আর দীপকে ডাকলেন অজিত। তিনজনে মিলে অতি সন্তর্পণে হাঁটা দিলেন আবার। আপাতত ভয় নেই।

'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে,' সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রায়া বললেন, 'ন্যাট এখনও ফিরছেন না কেন?'

হোটেলের নিচে এই ঘরটা নিরাপদ। টর্চের আলোর আভাসে বন্দুকের আলমারি আর তাকে বসানো ওয়াকি-টকির সারি দেখা যাচ্ছে। একটা টেবিলের উপর রাকেশ শুয়ে আছেন। তাঁর গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়ে দিলেন ভবতারণ। বললেন, 'ও কিছু নয়। এরকম বিলম্ব সব কাজেই হতে পারে। আমার ডাইনোসর পার্কেও তাই হচ্ছে। দেখুন না, ক'দিন বাদেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাথা গরম হয়ে যায় রায়ার। এখনও লোকটা সেই এক কথা বলে চলেছে। অন্ধ নাকি? নাকি বাস্তবকে ভুলে থাকার চেষ্টা? বলেন, 'দেখুন, আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা দেখা দরকার। নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করে অজিতদের খোঁজে বেরোতে হবে। অন্য সকলের কী হল দেখতে হবে।'

অ্যালান নিঃশব্দে বন্দুকের আলমারি খুলে সব চেয়ে শক্তিশালী রাইফেলটা বার করেন। তাতে ভরতে থাকেন বিস্ফোরক কার্তুজ।

'কী করছেন?' প্রশ্ন করেন ভবতারণ।

'এবার সুইচিং রুমে যেতে হবে। সশস্ত্র হয়েই যেতে হবে। কোনো জন্তু আক্রমণ করলে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবো এই রাইফেলের গুলিতে।'

'শুনুন, এই প্রাণীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান—'

'আপনার নাতি-নাতনির প্রাণের চাইতেও?'

আর কথা বলতে পারেন না ভবতারণ। তাক থেকে সুইচিং-এর ছক নামিয়ে নেন। বলেন, 'ন্যাটের মুখস্ত এটা, কিন্তু আমাকে দেখে নিতে হবে।'

'আপনি নয়, আমি যাবো অ্যালানের সাথে।'

'আপনি? যাওয়া উচিত আমারই। আপনি মেয়ে—'

'থাক! এখন পৌরুষ জাহির করার সময় নয়।' দুটো ওয়াকি-টকি তুলে নেন রায়া। 'ছকটা দেখে দেখে আমাকে বলবেন। আমি ঠিক সুইচগুলো টিপবো।'

ভবতারণ কিছু না বলে ওয়াকি-টকি চালু করেন। রাকেশ বলেন, 'ভাবী, সাবধানে যাবেন।' সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাইরের দিকে রওনা হন রায়া আর অ্যালান। রায়া ভাবেন, যতই শক্তিশালী হোক,

যন্ত্র যন্ত্রই। মানুষ ছাড়া সে অচল।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে প্রথম চোটে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তারপর দেখা যায় সমস্ত জায়গাটা নিঃশব্দ, থম থম করছে। ধীরে ধীরে এগোন দু'জনে পশ্চিম মুখে। একটু এগিয়ে বাঁধানো চত্বরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অ্যালান দেখেন মাটিতে কতগুলো পায়ের ছাপ। আঙুলের ছাপের একটা দাগ গভীর। ভেলোসির্যাপটর। আশেপাশেই কোথাও আছে ঘাপটি মেরে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় অ্যালানের। বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। ফিসফিস করে রায়াকে বলেন,

'ছুটে গেলে এই গাছগুলোর ওপাশেই তারের বেড়ার পিছনে সুইচিং রুম। দৌড়ে যান। রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'আপনি ?'

'আমাকে এখানে থাকতে হবে।'

'কেন ? ছুটে চলে গেলে দু'জনেই পৌঁছে যেতে পারবো।'

'না, পারবো না,' রাইফেল তুলে ধরেন অ্যালান, 'আমাদের উপর নজর রাখছে ওরা। দু'জনে একসাথে ছুটলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনি ছুটলে আর আমি এখানে দাঁড়ালে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওরা বিভ্রান্ত হবে। সেই সুযোগে আপনি পৌঁছবেন। আমার হাতের রাইফেলটা যে অস্ত্র তা ওরা বোঝে। আগে আমার দিকেই আসবে।'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়। ভাববেন না। এরকম অভিজ্ঞতা আমার নতুন নয়। যান, দেরি করবেন না, যান।'

লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে ছুটলেন রায়া। হোঁচট খেয়ে সামলে নিয়ে ডালপালা সরিয়ে কাঁটার আঁচড় খেয়ে ছুটতে লাগলেন। যে কোন মুহূর্তে পিঠে ঝাঁপ দেবে কালান্তক যম। কিন্তু না, ওই তো তারের বেড়া, ওই তো সুইচিং রুমের দরজা। ঢুকে পড়লেন রায়া। টেনে বন্ধ করলেন দরজা। ডাকতে লাগলেন, 'ন্যাট! ন্যাট!' কোনো সাড়া নেই। সব অন্ধকার।

বেল্ট থেকে টর্চটা নিয়ে জ্বাললেন রায়া। সিঁড়ি নেমে গেছে।

ওয়াকি-টকি কথা বলে ওঠে,

'মিসেস বোস, ভিতরে পৌঁছেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সরু প্যাসেজ ধরে কুড়ি পঁচিশ ফুট এগোলে একটা তিন মাথা মোড় পাবেন। ডানদিকে যান।' রায়া এগোন।

'সামনে একটা তারের জাল লাগানো পাল্লা আছে তো? হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে যান।' ভিতরে ঢোকেন রায়া।

'খানিক গেলেই ডান দিকে অনেকগুলো সুইচ দেখছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এমনি সুইচ টিপলে কিছু হবে না। প্রথমে প্রস্তুতি চাই। পর পর চারটে বড় হাতল দেখছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেগুলো ওপরে তুলে দিন।'

প্রধান বেড়াটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অজিত। উল্টো দিকে একটা কাঠের ফলক ঝুলছে কাঠের থাম্বার সঙ্গে। পিছন থেকে পড়তে না পারলেও অজিত জানেন তাতে লেখা আছে—সাবধান: দশ হাজার ভোল্ট তরিৎসঞ্চারিত।

এটা পেরোলেই মুক্তি। কিন্তু যাবে তো পেরোনো? বিদ্যুৎ নেই তো তারে?

একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে অজিত ছুঁড়ে দিলেন তারটার উপরে। আগুনের ফুলকি ছুটলো না। যাক। পেরোনো যাবে।

কংক্রিটের দেওয়ালের উপর উঠলেন অজিত। রিতি আর দীপ নিচে দাঁড়িয়ে। এক মুহূর্ত দোনামনা করে দু'হাতে চেপে ধরলেন সামনের তারটা। সারা শরীরটা কাঁপিয়ে 'আঁ আঁ' করে চিৎকার করে উঠলেন। রিতি আর দীপ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে একগাল হেসে ফেললেন অজিত।

ক্ষেপে গিয়ে রিতি বলে উঠল, 'মোটেও হাসির ব্যাপার নয় এটা।'

দীপ খিক খিক করে হাসতে লাগল। তার খুব পছন্দ হয়েছে রসিকতাটা।

তার বেয়ে উঠতে শুরু করলেন প্রথমে অজিত আর রিতি। একটু থমকে, তাঁদের পিছনে দীপ। তার একটু ভয় করছে। অতটা উঁচুতে উঠতে হবে।

'তুলেছেন?'

'তুলেছি।'

'এবারে দেখুন পাশে একটা বড় সবুজ বোতাম। সেটা টিপলেই পাশের বোর্ডে পর পর অনেকগুলো আয়তাকার কাঁচ রয়েছে, সেগুলোর পাশের বোতামে আলো জ্বলে উঠবে।'

সবুজ বোতাম। হ্যাঁ, ওই তো। টিপে দিলেন রায়া। উপর থেকে নিচে অনেকগুলো আয়তাকার লম্বা কাঁচের পাশে ছোট ছোট বোতামের আলো জ্বলে উঠল। কাঁচগুলোর গায়ে লেখা রয়েছে বিভিন্ন জায়গার নাম, বোতামগুলো টিপলেই যেখানে যেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু হবে।

বেড়া টপকে ওপারে নিচে নেমে গেছেন অজিত। রিতিও নেমেছে। কিন্তু সবচেয়ে ওপরের তারে পৌঁছে সেটা পার হয়ে এপাশে এসে নিচের দিকে তাকিয়েই দীপের শরীরটা একেবারে শক্ত হয়ে গেছে, ভয়ে আর নামতে পারছে না সে।

অজিত আর রিতি হাঁটতে শুরু করেছেন। হঠাৎ তারস্বরে ক্ল্যাক্সন বেজে উঠলো। ফিরে অজিত দেখেন, থামের উপরে দু'টো আলোর মধ্যে সবুজটা জ্বলছে। এক্ষুনি তারে বিদ্যুৎ এসে যাবে। তাই সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। দীপ তখনও অনেক উপরে।

'লাফ মারো, দীপ, লাফ মারো,' চিৎকার করে উঠলেন অজিত। 'এক্ষুনি বিদ্যুৎ এসে যাবে।'

'পারছি না, পারছি না আমি,' অসহায় ভীত কণ্ঠে দীপ কাতরে ওঠে।

'পারতেই হবে। লাফ দাও, লাফ দাও।'

'দীপ, ভয় নেই, লাফ দে,' রিতিও চিৎকার করে।

বোতামগুলো টিপতে আরম্ভ করলেন রায়া একে একে।

এক।

'লাফাও দীপ। কিছু হবে না।'

দুই।

'আমি নিচে দাঁড়াচ্ছি লুফে নেবো তোমাকে।'

তিন। চার। পাঁচ।

আলো জ্বলে উঠছে কাঁচগুলোয়।

নিচের দিকে তাকায় দীপ। কী করবে এখন?

ছয়। সাত। আট।

বারো নম্বর বোতামে প্রধান বেড়ার বিদ্যুৎ আসবে।

'আর সময় নেই, দীপ। লাফাও।'

নয়। দশ। এগারো।

দীপ চোখ বুজে হাত ছেড়ে দেয়। রায়া বারো নম্বর বোতাম টেপেন। দীপের হাত যখন তার থেকে আধ ইঞ্চি দূরে তখন বিদ্যুৎ আসে তারে। দূর থেকেই বিদ্যুৎ দীপের হাতে সঞ্চারিত হয়। ছিটকে আসে দীপের দেহ। পড়ে যায় অজিতের বাড়িয়ে থাকা হাতের উপরে। অজিতও উল্টে পড়ে যান মাটিতে।

রিতি চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, 'দীপ! দীপ!'

অজিত দীপের বুকে কান পাতেন। হ্যাঁ, খুব মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রাণ আছে এখনও শরীরে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে?

নিরাপদ আশ্রয়

একটা একটা করে সব ক'টা আলো জ্বলে উঠল! সুইচগুলোর পাশে জালের দেওয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত রায়া স্বস্তির হাসি হাসলেন। যাক, নিয়ন্ত্রণ ফিরল তাহলে। এবারে—

তাঁর সমস্ত আনন্দ নিভিয়ে দিয়ে তারের বাধা ছিঁড়ে ফেলে ঘাড়ের পাশ দিয়ে হিস হিস শব্দ করে একটা মাথা বেরিয়ে এল। আতঙ্কে ছিটকে সরে এলেন রায়া। একটা র‍্যাপটর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। সর্বশক্তিতে তার মুখের উপর একটা লাথি মারলেন রায়া। এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ভেলোসির‍্যাপটর। এক দৌড়ে বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে হুড়কো টেনে দিলেন রায়া। উল্টো দিকে দেওয়ালের উপরে হেলান দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। দেওয়ালের একটা ফাঁক থেকে হঠাৎ তাঁর কাঁধে কী যেন পড়ল। তাকিয়ে দেখেন একটা হাত। চামড়ার রং কালো। ভরসা পেয়ে রায়া বলে উঠলেন, 'এলেন ন্যাট এতক্ষণে! দেখেছেন এখানেও একটা র‍্যাপটর—'

কিন্তু কোথায় ন্যাট! হাতটা ধরেই সভয়ে দেখলেন রায়া তিনি ধরে আছেন একটা ছিন্ন বাহু, কনুইএর কাছ থেকে ছিঁড়ে এসেছে। ন্যাট আর বেঁচে নেই। কোনো রকমে সেই বিভৎস প্রত্যঙ্গটা

ফেলে দিলেন রায়া।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার তারের দরজার উপর এসে আছড়ে পড়ল র‍্যাপটর। তার দাপাদাপিতে দরজাটা ভেঙে যাবার উপক্রম। বেশিক্ষণ টিকবে না সামান্য পাল্লা। রায়া আবার ছুটলেন বেরোবার পথের দিকে। পায়ে টান পড়তে দেখলেন একটা কাটিম থেকে তার বেরিয়ে তাঁর পায়ে জড়িয়ে গেছে। সেই নিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটলেন তিনি। পড়ি কি মরি করে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন রায়া। বাইরে এসে দরজা টেনে দিয়ে দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন। ভয়ে, ভাবনায়, নিজেদের অসহায়তার কথা ভেবে রায়ার চোখ ফেটে কান্না আসে।

অ্যালান একটু পিছিয়ে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ রাখছেন বাঁধানো চত্বরটার উপরে। এখনও র‍্যাপটরগুলোর সাক্ষাৎ মেলেনি। কোথায় গেল?

হঠাৎ ঝোপের মধ্যে দিয়ে অ্যালান দেখলেন খুব কাছে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল একটা ভেলোসির‍্যাপটর। চুপ করে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল সেই শয়তান।

পেয়েছি নাগালের মধ্যে। রাইফেলটার বাঁট এতক্ষণ ভাঁজ করা ছিল কোমরের কাছ থেকে চালাতে সুবিধা হবে বলে। এবার একটুও শব্দ না করে বাঁট সোজা করতে আরম্ভ করলেন তিনি। ভাঁজ খুলে সোজা হল ইস্পাতের হাতল। সামান্য কট শব্দ করে খাপে খাপে বসে গেল। তৈরি এবার। ঠাণ্ডা মাথায় কাঁধে তুলে রাইফেল তাক করলেন অ্যালান। ঘোড়ায় আঙুল দিয়ে প্রস্তুত হলেন অভিজ্ঞ শিকারি। এক্ষুনি বিস্ফোরক কার্তুজের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বেজন্মা জানোয়ার।

কিন্তু গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেলেন না অ্যালান। তাঁকে হতচকিত করে বাঁ দিকের ঝোপটা নড়ে উঠল। ডালপালা সরিয়ে দেখা দিল আর একটা নরকের দূত। এক ঝটকায় রাইফেল ঘুরিয়ে সেদিকে ফিরলেন অ্যালান ওয়েবস্টার। বড় দেরি হয়ে গেছে। নিমেষের মধ্যে তাঁর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত্যুদূত। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন তিনি। করাতের মতো দাঁতের সারি তাঁর

গলায় বসে গেল। ধারালো নখে ফালা ফালা হয়ে গেল তাঁর পেট। কুৎসিত একটা শব্দ করে তাঁর পেটের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিল র‍্যাপটর। ততক্ষণে করুণাময় মৃত্যু তাঁকে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

'দীপ মরে গেছে,' হাহাকার করে কেঁদে উঠে বলে রিতি।

'না, দীপ বেঁচে আছে', বলেন অজিত।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে দীপ। অজিত তার মুখে মুখ দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপরে বুকের উপর চাপ দিয়ে হার্ট ম্যাসাজ দিতে থাকলেন। একবার মুখে নিঃশ্বাস দেন, আবার হার্ট ম্যাসাজ। এই মিনিট খানেক চলল। তারপরে দীপের ছোট্ট শরীরটা কেঁপে উঠল। খক খক করে কেশে উঠে বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ খুলল সে। হাততালি দিয়ে হেসে উঠল রিতি। অজিতের মুখে হাসি ফুটল এবার। দীপের বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন অজিত বারে বারে। দীপ তখনও উঠতে পারছে না।

কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা যাবে না। এখানে বসে থাকলে তীরে এসে তরী ডোবার সম্ভাবনা। ভিজিটরস্ সেন্টার এখান থেকে বেশি দূরে বলে মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে রায়াকে নিয়ে কোনো রকমে দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে পারলে বাঁচা যায়। এরকম বিদ্যুৎ সরববাহ বন্ধ হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও যদি থাকে তাহলে ডাইনোসর পার্ককে নিরাপদ ঘোষণা করা যাবে না! রাকেশ ঠিকই বলেছিলেন। জটিল ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে যে কোনো সময়ে। আর এও বোঝা গেছে, ডাইনোসর আর মানুষের মুখোমুখি হওয়া আদৌ সুখপ্রদ হবে না। মানুষের ঔদ্ধত্যের উচিত শিক্ষা দিয়েছে প্রকৃতি। তবে এও জানতে হবে কী করে এরকম দুর্ঘটনা ঘটল।

এইসব ভাবতে ভাবতে দীপকে কোলে নিয়ে হাঁটছিলেন অজিত। রিতি পাশে পাশে চলেছে। একটু পরেই পৌঁছে যাওয়া যাবে নিরাপদ আশ্রয়ে।

ভবতারণ দাঁড়িয়ে আছেন স্তব্ধ হয়ে। ঘরে আলো জ্বলছে। রাকেশ আধ শোয়া হয়ে রয়েছেন টেবিলের উপরে। বিদ্যুৎ ফিরে আসার পর থেকেই বারে বারে রায়াকে ডাকছেন তিনি ওয়াকি-টকিতে। সাড়া পাচ্ছেন না। তাহলে কি ন্যাট, অ্যালান, রায়া সকলেই মৃত? ফোন এখনও কাজ করছে না। ইনকিউবেশন রুম, নার্সারি, রেস্তরাঁ, হোটেল, কোথা থেকেও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে একবার দেখেছেন ভবতারণ, একটা ভেলোসির্যাপটর চলে গেল রেস্তরাঁর দিকে। তাড়াতাড়ি আবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। অজিত, রিতি আর দীপই বা কোথায়?

চারপাশে তাঁর স্বপ্নের ডাইনোসর পার্কের ধ্বংসাবশেষ। এই কয়েক ঘন্টায় একেবারে বুড়িয়ে গেছেন ভবতারণ। রাকেশের দিকে তাকিয়ে ভবতারণ ভাবেন, এতগুলো তাজা প্রাণ আমার জন্যেই শেষ হয়ে গেল। আমরাই বা আর কতক্ষণ টিঁকে থাকব কে জানে! ডাইনোসরদের শেষ বার খাওয়ান হয়েছিল গত কাল বিকেলে। আজ বিকেলের মধ্যেই ওরা দুর্বল হয়ে পড়বে লাইসিনের অভাবে। তারপরে বেশিক্ষণ বাঁচবে না। এত বিপদের মধ্যেও ওদের জন্যে কষ্ট হয় তাঁর। বিনাদোষে ওরাও মরতে চলেছে। ওরা যা করেছে বা করতে চলেছে তা ওদের প্রকৃতি। আসল দোষী আমি। রাকেশের কথাই ঠিক।

নিজেকে সম্পূর্ণ সক্ষম করে নিতে কমপিউটারের কিছুটা সময় লাগবে। দরজা-জানলার বৈদ্যুতিন তালার ব্যবস্থা কমপিউটার কনসোলে বসে চালু করতে হবে। ততক্ষণ সব অরক্ষিত থাকবে। কিন্তু সে জন্যে কনট্রোল রুমে যেতে হবে। অথচ যাওয়ার রাস্তা আটকা।

নিষ্ফল বিলাপে মগ্ন হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন পৃথিবীর অন্যতম গুণকুবের ভবতারণ চক্রবর্তি। সর্বস্ব দিলেও এই প্রাণগুলো ফিরবে না আর।

ভিজিটরস্ সেন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন অজিত। কোলে দীপ। এখনও নেতিয়ে আছে। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে ফেরার মানসিক ধাক্কা কাটেনি তার। রিতি পিছন থেকে তার হাত ধরে আছে।

কোথাও কেউ নেই। কেমন যেন একটা ভীতিপ্রদ নীরবতা চারদিকে। বোঝা যাচ্ছে কোনো একটা ভয়ানক কিছু ঘটে গেছে। সকলে হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে। রেস্তরাঁর ভিতরে ঢুকে বড় টেবিলটার উপরে দীপকে বসালেন অজিত। বললেন,

'বলো দোস্ত, কেমন লাগছে এখন?'

'ভালো।'

'বাঃ, এই তো জোয়ান ছেলের মতো কথা। তা তোমরা ভাইবোনে এক কাজ কর। এখানে বসো। আমি বাইরে খুঁজে দেখি লোকজন সব কোথায় গেল।'

তাঁর হাত চেপে ধরে রিতি। একা থাকতে ভয় লাগছে। দীপের যদি শরীর খারাপ হয় আবার? 'এখানে মনে হয় কোনো ভয় নেই। আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি।'

ওদের বসিয়ে রেখে বেরিয়ে যান অজিত। মাথার মধ্যে একটা ভয় উঁকি মারছে। রায়া কোথায়?

রিতি চেয়ারে বসে পড়ে। দু'এক মুহূর্ত পরেই দীপের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটে। টেবিল থেকে নেমে পড়ে এদিক ওদিক তাকায়। রান্নাঘরে ঢোকার দরজার ধারে কাঁচের আলমারিটা দেখে জিভে জল আসে। পেটের মধ্যে ছুঁচো ডন মারছে অনেকক্ষণ থেকেই। ভয়ে উত্তেজনায় এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে খাবারের দিকে এগোয় দীপ।

থরে থরে সাজান রয়েছে নানা রকম কেক, পেস্ট্রি, পুডিং আর মিষ্টি। দুটো প্লেট নিয়ে প্রচুর পরিমাণে সেসব খাবার সংগ্রহ করে দুই ভাইবোন। টেবিলে ফিরে এসে গোগ্রাসে দু'জনে খেতে শুরু করে দেয়। রিতির চুল উসকোখুসকো, মুখে ধুলোকাদা মাখা, পরনের সার্ট প্যান্ট ছিন্নভিন্ন। দীপের ডান চোখের উপরে গভীর ক্ষত, হাত মুখ নানা জায়গায় ছড়ে গেছে। পিঠে-কোমরেও আঘাত

লেগেছে, পা মচকে গেছে।

পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে থাকে দুই ভাইবোন। চারদিকে কাঁচের জানলায় শার্সির উপরে বিভিন্ন জাতের ডাইনোসরের ছবি। এক জায়গায় প্যারাসরোলোফাসরা জল খাচ্ছে, আরেক জায়গায় দৌড়চ্ছে গ্যালিমাইমাস। ব্র্যাকিওসরাসের মাথা উঠেছে আকাশপানে। টিরানোসরাস লাফাতে উদ্যত অন্য একটা ছবিতে। বর্ণাঢ্য ছবিগুলো দেখলে গত রাত্রের বিভৎসতার কথা ভুলেই যেতে হয়। রিতির ঠিক উল্টোদিকের শার্সিটাতে পূর্ণাবয়ব একটা ভেলোসির্যাপটরের ছবি। দু'জনে হাপুসহুপুস শব্দে খেয়ে চলে।

কোথাও কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না অজিত। মনে পড়ল, হোটেলের নিচে অস্ত্রশালার কথা। ওটাই সব চাইতে নিরাপদ লুকোবার জায়গা। চাতাল পেরিয়ে সেদিকে হাঁটা দিলেন তিনি। এতক্ষণ বাচ্চাদের সামনে দুশ্চিন্তার কোনো বাহ্যিক প্রকাশ ঘটতে দেননি তিনি। এখন চিন্তার ছাপ তাঁর চোখে মুখে। কী করা যায় এখন?

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছেন, হঠাৎ পিছন থেকে নারীকণ্ঠে চিৎকার শুনলেন, 'অজিত! অজিত! পালাও, পালাও!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেন ছুটে তাঁর দিকে আসছেন রায়া। চোখে মুখে ভীতির ছাপ। ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন রায়া।

'বেঁচে আছো, বেঁচে আছো তুমি!' ফুঁপিয়ে ওঠেন রায়া।

'হ্যাঁ, আমরা তিনজনেই ঠিক আছি। কী হয়েছে এখানে?'

'এক্ষুনি বলার সময় নেই। পিছনে তেড়ে আসছে ভেলোসির্যাপটর। চলো, আগে, তাড়াতাড়ি চলো।'

ছুটতে ছুটতে এসে হোটেলের নিচের ঘরে ঢুকলেন দু'জনে। ভবতারণ মাথা নিচু করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। রাকেশ আধশোওয়া টেবিলের উপরেই। ইতিমধ্যেই তাঁর পায়ে ক্ষত বিষিয়ে উঠতে শুরু করেছে। যন্ত্রণায় কষ্ট হচ্ছে খুব, কিন্তু ঠোঁট চেপে সহ্য করে আছেন। মরফিন নিতে ভরসা হচ্ছে না। যদি হঠাৎ পালাবার প্রয়োজন হয়।

দু'চার কথায় গোটা পরিস্থিতির কথা অজিতকে বললেন রায়া।

অজিত শিউরে উঠলেন। রিতি আর দীপকে মারাত্মক অবস্থার মধ্যে ফেলে এসেছেন তিনি।

বন্দুকের আলমারি থেকে তাড়াতাড়ি একটা রাইফেল নিলেন অজিত। গুলি ভরে নিয়ে রায়াকে বললেন, 'তোমরা এইখানে অপেক্ষা কর। আমি বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আসছি।'

'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'চলো তাহলে।' বৃথা সময় নষ্ট করলেন না অজিত। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চললেন দু'জনে বাইরে।

তাদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভবতারণ। তাঁর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েছেন তিনি। নাতি-নাতনি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে শুনেও তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

অজিতরা বেরিয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎই যেন সচেতন হলেন ভবতারণ। ফিসফিস করে বন্ধ দরজাটার দিকে মুখ করে, অজিতের উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, বলে উঠলেন, 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।'

এক গাল হাসে রিতি দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে। পেস্ট্রি থেকে ক্রিম লেগে দীপের ঠোঁটের দু'পাশ সাদা হয়ে আছে। 'গোঁফ গজিয়েছে তোর!' ঢাউস এক চামচ পুডিং মুখে তুলতে তুলতে বলে রিতি।

দীপের মুখ ঠাসা। কোনো উত্তর দেয় না। খালি হাসে। নিজের প্লেটের দিকে তাকিয়ে দেখে আর ক'টুকরো কেক বাকি। মুখ তুলে আবার তাকায় দিদির দিকে। এবার হাসি মুছে যায় মুখ থেকে। দেখে, রিতির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বিস্ফারিত নেত্রে সে তাকিয়ে আছে দীপের পিছনের জানলার দিকে।

কী হল? দীপ মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কাঁচের শার্সির গায়ে আঁকা রয়েছে ভেলোসির‍্যাপটরের ছবি। দীপের ভয়ার্ত দৃষ্টির সামনে সেই ছবি থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল একটা ছায়া। মুরগির মতো মাথাটা আগুপিছু করতে করতে ছায়াটা এগোচ্ছে। ছায়ার মাথাটায় সাপ আর গিরগিটির আদল। দুটো হাত সামনে প্রসারিত।

ধীর গতিতে চারদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছে ছায়াটা।

'ভেলোসির‍্যাপটর!' এক লাফে টেবিল ছেড়ে ওঠে দুই ভাই বোন। কোথায় পালানো যাবে! এবার বোধ হয় আর রক্ষা নেই। কোথায় গেল অজিতকাকু?

দেখতে দেখতে নজরে পড়ে রান্নাঘরের দরজা। ছুটে ভিতরে ঢুকে দরজা টেনে বন্ধ করে দেয় দু'জনে। খট করে আটকে যায়, দরজার গা-তালা।

লম্বা ঘরটা। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত জুড়ে আছে দীর্ঘ দু'টো স্টেনলেস স্টিলের টেবিল। চারদিকে নানারকম পাল্লা লাগানো তাক। অনেক হাতা খুন্তি ঝুলছে নানা জায়গায়। টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে বাসনপত্র। ঝকঝকে তকতকে সব কিছু। ঘরটার ছাতটাও স্টেনলেস স্টিল।

দরজা দিয়ে ঢুকেই লম্বা জায়গা। প্রথম টেবিলটা ডানহাতে। দৌড়ে সেই টেবিলের শেষ প্রান্তে আড়ালে মেঝের উপর বসে পড়ে দুই ভীত-সন্ত্রস্ত বালক বালিকা। বুকের ধুকপুকানি বোধ হয় এবার সবাই শুনতে পাবে।

দরজার গায়ে এক মানুষ উঁচুতে গোলাকার কাঁচের জানলা। তার পিছনে আবির্ভূত হল একটা লম্বাটে মুখ আর নাকের ছিদ্র। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। নিঃশ্বাসের বাষ্পে ঝাপসা হয়ে গেল কাঁচ। পরিষ্কার হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। এবারে কাঁচের ভিতর দিয়ে উঁকি মারল একটা চোখ। হিংস্র চাতুর্যে ভরা সেই চোখের তারা গোল নয়, পটলের মতো, আর চোখের মণির উপরে খাড়াভাবে বসানো। মনোযোগ দিয়ে সেই চোখ রান্নাঘরের ভিতরটা দেখে নিল ভালো করে। সরে গেল তারপর।

রিতি আর দীপ কিছু দেখতে না পেলেও বেশ অনুভব করতে পারছিল, র‍্যাপটরটা দোরগোড়ায় এসে গেছে। এবার খটখট শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখলো দীপ, দরজার হাতলটা নড়ছে। তার বিহ্বল চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করল সেটা। তারপর পাল্লাটা খুলে গেল। মাথা দিয়ে বাইরে থেকে ঠেলে হাট করে দরজা খুলে ফেলল ভেলোসির‍্যাপটর।

ভয়ঙ্করের হানা

রান্নাঘরটার ছাতও স্টেনলেস স্টিল দিয়ে ঢাকা। র‍্যাপটরটা উপর দিকে তাকায়। নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে উত্তেজিত হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। মুখ দিয়ে ধাক্কা দেয়। ঝং ঝং আওয়াজ হয়। আবার ধাক্কা দেয। কিছু না করতে পেরে বিরক্ত হয়ে হিস হিস শব্দ করে। তারপর গর্জন করে ওঠে। এইবার খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকে আরেকটা ভেলোসির‍্যাপটর।

মেঝেতে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা বাচ্চাদুটোর বুক শুকিয়ে যায়। রিতি চাপা গলায় বলে ওঠে, 'ঢুকে পড়েছে। দীপ, কী হবে এখন?' দীপের মুখে কথা সরে না।

ভিতরমুখে এগোতে থাকে র‍্যাপটর দুটো। বোঝাই যাচ্ছে, দেখতে না পেলেও এখানে যে শিকার লুকিয়ে আছে তা ওরা আন্দাজ করতে পেরেছে যেমন করেই হোক।

পিছন দিক দিয়ে উঁকি মারে রিতি। দেখে, সেই আধা-সাপ আধা-গিরগিটি মাথা একটা এগোচ্ছে তাদের লুকোবার জায়গার দিকে। কী করবে ভেবে পায় না রিতি। এইটুকু বন্ধ ঘরে কতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা যাবে দুই যমদূতের হাত থেকে বেঁচে? দীপকে বলে, 'চল, দৌড়ে ওদিকে চলে যাই।' দীপ ভয়ে পাথর

হয়ে গেছে। নড়তে পারছে না। সে কেবল মাথা নেড়ে বলে, পারবো না।

রিতি ওর হাত ধরে টানে। টেবিলটার পিছন দিয়ে ফিরে চলে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে আবার। র‍্যাপটরটা যেদিকে এগোচ্ছে তার উল্টোদিকে। টেবিলটার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছে তখন র‍্যাপটর দুটো টেবিলের ওদিকে ঠিক ওদের পাশেই। হঠাৎ আবার গর্জন করে ওঠে একটা র‍্যাপটর। ঠিক যেন ভয় পাইয়ে শিকারকে লুকোনো জায়গা থেকে বের ক'রে আনতে চায়। সেই রক্ত হিম করা হিংস্র চিৎকারে ভীষণ ভয় পেয়ে থেমে যায় রিতি আর দীপ। বসে পড়ে কাঁপতে থাকে। ভয়ে দু'জনের হাত পা ছেড়ে আসছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে অসহায় দুই শিশুর।

র‍্যাপটর দুটো এগোচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপে পায়ের শব্দের সঙ্গে আরও একটা কট্ কট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পায়ের ছুরির মতো নখটা ঠুকছে মেঝেতে। টেবিলের কাছের র‍্যাপটরটা এবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে কী আছে ঘরের ওপাশে। মাথাটা রিতি আর দীপের ঠিক উপরে। রিতি দেখে উপরের আলোয় মাথাটার ছায়া পড়েছে তাদের সামনে মাটিতে।

দুই ঘাতক এক পা এগোয় আর দাঁড়িয়ে যায়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওরা নিশ্চিত যে এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে দুটো প্রাণী যাদের ছিঁড়ে ফেলা তাদের কাছে মুহূর্তের কাজ। আবার এগোয় দুটো র‍্যাপটর। যেখানে রিতি আর দীপ প্রথমে বসেছিল সেই দিকে। হঠাৎ কেন যেন নিচু হয়ে অন্যদিকে ফেরে একটা দুঃস্বপ্নের জীব। তার উত্থিত লেজের আঘাতে টেবিলের উপরে জড়ো করে রাখা বাসনপত্র ঝনঝন শব্দে রিতি আর দীপের মাথার উপরে পড়ে। ভীষণ হকচকিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে দু'জনে চলে আসে দ্বিতীয় টেবিলটার দরজার দিকের প্রান্তে। লুকিয়ে পড়ে টেবিলের আড়ালে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ঠিক সেই প্রান্তে টেবিলের গায়ে হুকে ঝোলানো রয়েছে সারি সারি ছ'সাতটা হাতা, খুন্তি আর ঝাঁঝরি। দীপের পিঠে লেগে ঠং ঠং শব্দ হয়। হাত দিয়ে সেগুলোকে সামলে ধরে দীপ। পড়ে না যায়।

বাসন পত্রের ঝনঝনানি আর দুই ভাইবোনের অস্ফুট চিৎকারে সজাগ হয় দুই ভেলোসিরাপটর। প্রথমটা এক লাফে টেবিল পেরিয়ে মাঝখানে এসে পড়ে। দেখতে থাকে আওয়াজ এল কোথা থেকে। দ্বিতীয় টেবিলের পিছনে লুকিয়ে রিতি খুব দ্রুত চলে যায় তার অন্য প্রান্তে! সেখান থেকে ইশারায় ভাইকে ডাকতে থাকে, চলে আয়, চলে আয়। দীপ একটু এগোয়। তারপর থেমে যায়; বসে পড়ে।

আর পারছে না দীপ। ক্লান্তিতে, ভয়ে, তার শরীরটা অবশ হয়ে আসছে। সে মাথা নেড়ে বলে, না, যাবো না। রিতি আবার ডাকে। ঠিক তখনই একটা হাতা হুক থেকে খুলে ঠন করে পড়ে যায় মাটিতে। র‍্যাপটরটা তাকায়। তার চোখটা ঝলসে ওঠে। পাওয়া গেছে। এবার ফের এগোতে থাকে সে। ওখানেই লুকিয়ে আছে খাবার। অন্য র‍্যাপটরটা লাফিয়ে ওঠে প্রথম টেবিলের উপরে। একজন নিচ থেকে, অন্যজন উঁচু থেকে দেখলে শিকার খুঁজে পেতে সুবিধা হবে।

ক্রমশ দীপের দিকে আসছে দুই রাক্ষস। ধরে ফেলবে এক্ষুনি। দীপ যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। নড়তেই পারছে না। রিতি অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে। আরও কাছে চলে আসছে র‍্যাপটর দুটো। আর কয়েক ফুট। আরও কাছে, আরও কাছে। নিচের র‍্যাপটরটা মুখ ঘোরায় টেবিলের এপাশে দীপের দিকে যাবে বলে। আর এক ইঞ্চি এগোলেই দীপকে দেখতে পাবে।

এতক্ষণ রিতি ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। এবার সে অনন্যোপায়। এক্ষুনি দীপ পড়বে র‍্যাপটরের খপ্পরে। পড়ে থাকা একটা হাতা তুলে নিয়ে দীপের উল্টোদিকের মেঝেতে প্রাণপণে শব্দ করে রিতি সেটা ঠুকতে থাকে ঠক ঠক, ঠক ঠক।

চকিতে সে দিকে ফেরে র‍্যাপটর দুটো। টেবিল থেকে লাফিয়ে নামে একটা, অন্যটাও দীপের বিপরীত দিকে চলে আসে এবার। দুটোতে মিলে তাকিয়ে থাকে শব্দটার উৎসের দিকে।

টেবিলটার যে প্রান্তে রিতি লুকিয়ে ছিল সেখানে হঠাৎই দেখা যায় একটা দরজা লাগানো খুপরি। টেবিলটারই গায়ে। হাতল ধরে উপরে টানতেই ঢাকনাটা সড় সড় করে উপরে উঠে যায়।

রিতি সেই খুপরির ভিতর ঢুকে পড়ে। তারপর টেনে নামিয়ে আবার সেটা আটকে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু হায় রে, এতো আটকে গেছে। কিছুতেই নামছে না। হতাশায় রিতির দু'চোখ ফেটে জল আসে।

র‍্যাপটর দুটো তাকিয়ে আছে এদিকে। রিতি ঢাকনা টানার চেষ্টা করছে। তার প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে উল্টোদিকে স্টেনলেস স্টিলের আলমারির পাল্লার চকচকে গায়ে। সেই প্রতিফলন তাকিয়ে দেখে একটা র‍্যাপটর। হাঁ করে করাতের মতো খাঁজ কাটা ধারালো দাঁতের সারি দেখিয়ে হিস হিস করে ওঠে সে। তারপর ছোবল মারার আগে সাপ যেমন পিছনে মাথা হেলায় ঠিক সেই ভঙ্গিতে একবার মাথা পিছিয়ে, মেঝেতে মারাত্মক নখের কটকট শব্দ তুলে অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় সেদিকে ছুটে যায় ভেলোসির‍্যাপটর।

খুপরির ঢাকনি টেনে নামানোর চেষ্টা করতে করতে রিতি দেখে, প্রচণ্ড গতিতে ছুটে তার সেই প্রতিচ্ছবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ভয়াল প্রাণী। প্রতিবিম্বটাকেই আসল বলে মনে হয়েছে জন্তুটার। নিজের গতিই র‍্যাপটরের সাধে বাধার সৃষ্টি করল। অত জোরে এসে ধাতব দরজায় মাথা ঠুকে যাওয়ার আঘাত শক্তিশালী ডাইনোসরও সহ্য করতে পারল না। কয়েক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়ল সেই পশু। অভাবনীয় ভাবে রক্ষা পেয়ে রিতি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, র‍্যাপটরের পায়ের কাছ ঘেসে খুপরিটা থেকে বেরিয়ে এল।

দীপ দেখল, দিদি খুব তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে ডান দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে, দেখতে না পেলেও দীপ অনুভব করল, অন্য র‍্যাপটরটাও সেদিকে যেতে শুরু করেছে। দিদির সমূহ বিপদ দেখে চেতনা আর শক্তি দুই-ই ফিরল দীপের। ডান দিকে তাকিয়ে দেখল একটা বড় খোলা পাল্লার আড়াল থেকে আলো আসছে। একটু যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেখান থেকে। দীপ বুঝল ওটা রান্নাঘরের লাগোয়া, ঘরের মতো বড় হিমঘর। বেশ কিছুদিনের মাংস ইত্যাদি খাবারদাবার এখানে জমিয়ে রাখা হয়, একথা দীপ শুনেছে আগেই। মুহূর্তে দীপের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

চিন্তায় একটুও সময় ব্যয় করল না দীপ। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল হিমঘরের দরজাটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রিতির দিকে এগোনো থামিয়ে ঝটিতি ঘুরে দীপের পিছনে দুর্দান্ত গতিতে ছুটল ভেলোসির‍্যাপটর।

দীপের পায়ে মচকে যাবার ব্যথা, গত রাত্রে গাড়ির মধ্যে চাপা পড়ায় কোমরেও আঘাতের যন্ত্রণা। কিন্তু প্রাণের দায়ে সব কিছু ভুলে ছুটছে দীপ। পিছনে আসছে মৃত্যু। দরজায় পৌঁছে ভিতরে ঢুকতেই মেঝেতে জমে থাকা বরফে পা হড়কে যায় দীপের। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় সে। তার এক লহমা পরেই র‍্যাপটরটাও দরজা পেরোয়। পা পিছলে যায় সেটারও। আছড়ে গিয়ে পড়ে সামনে টাঙিয়ে রাখা বড় বড় মাংসের চাঁইএর গায়ে।

ঠিক করাই ছিল কি করবে। নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে চলে আসে দীপ। রাক্ষুসে শয়তানটারও নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগে খুব কম। সেও দরজার দিকে ঝড়ের বেগে ফিরে আসে। দীপ দরজাটা ঠেলে বন্ধ করতে যায়। ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে র‍্যাপটর। খুব জোরে পাল্লাটা বন্ধ করে দীপ। ভারি পাল্লাটা র‍্যাপটরের মাথা চেপ্টে দেয়। মাথা পিছিয়ে নেয় জীবটা, মুহূর্তে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে শিকলও লাগিয়ে দেয় দীপ। টেবিলের গায়ে ভর দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ছোট্ট সাহসী ছেলেটা।

পিছন থেকে কেউ তাকে জড়িয়ে ধরে টানাতে চমকে ওঠে আমাদের ক্ষুদে বীর। অন্য কেউ নয়, রিতি তাকে টেনে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় রান্নাঘর থেকে রেস্তরাঁয়। রান্নাঘরের অন্য প্রান্ত থেকে তাদের চলে যাওয়া নিরীক্ষণ করে একটা র‍্যাপটর। তার মাথার আঘাত এখনও একটু পীড়া দিচ্ছে। তাছাড়া, খুব সতর্ক জীব ভেলোসির‍্যাপটর। শিকার সংখ্যায় বেশি হলে চট করে তাকে একা আক্রমণ করে না তারা। দল বেঁধে শিকার করাই তাদের অভ্যাস।

রিতি আর দীপ ছুটে খাবার ঘরে ঢোকে। ঠিক তখনই অন্যদিক দিয়ে ঘরে ঢোকেন অজিত আর রায়া। রিতি ছুটে গিয়ে অজিতের হাত ধরে। 'শিগগির চলো কাকু, পালিয়ে চলো,' হাঁপাতে হাঁপাতে

বলে রিতি, 'র‍্যাপটরটা রান্নাঘরে। এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে!'

কোনো কথা না বলে বাচ্চা দুটোর হাত ধরে কনট্রোল রুমে ঢুকে পড়েন অজিত আর রায়া। ওই ঘরটাই সব চাইতে নিরাপদ হবে এই সময়ে।

কনট্রোল রুমে সব আলো জ্বলছে এখন। রায়া ছুটে গিয়ে কমপিউটারের সামনে বসে পড়েন। সব ক'টা মনিটর ফাঁকা। টিভি পর্দাগুলো চালু আছে, কিন্তু সবগুলিই ফাঁকা। কোনো লেখা দেখা যাচ্ছে না। অজিত দরজাটা বন্ধ করতে যান। দরজা আটকে দেন হাতল ঘুরিয়ে। চিৎকার করে বলেন, 'রায়া, বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা চালু কর।'

বলতে বলতেই দরজায় ত্রিকোণ কাঁচের গায়ে দেখা দেয় ভেলোসিরাপটরের মুখ। দেখা যায় দরজার হাতলটা ঘুরতে শুরু করেছে। দরজা খুলতে চেষ্টা করছে রক্তলোলুপ চতুর জীব।

সর্বশক্তি দিয়ে দরজা আটকে ধরেন অজিত। কিন্তু কতক্ষণ পারবেন আসুরিক জোরের বিরুদ্ধে একলা। হাত থেকে রাইফেলটাও ছিটকে গেছে। তাঁর অবস্থা দেখে রায়াও ছুটে যান। ঠেলে আটকে রাখার চেষ্টা করেন। র‍্যাপটরের ধাক্কায় দরজাটা বোধহয় এবার ভেঙেই যাবে। রিতি আর দীপ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

দু'হাতে দরজা ঠেলে রেখেছেন অজিত। দরজাটা একবার ফাঁক হয়। ঢুকে আসে র‍্যাপটরের ভয়াবহ হাত। নখ দিয়ে আঘাত করতে চায় অজিতের হাতে। কোনো রকমে আঘাত এড়িয়ে তবু দরজা ধরে থাকেন তিনি।

রিতি তাকায় কমপিউটার পর্দার দিকে। সেখানে ফুটে উঠেছে একটা ছবি। রিতি বলে ওঠে, 'এটা মনে হচ্ছে আমার চেনা।' কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে মনিটরটার দিকে এগোয় রিতি। তার স্কুলের কমপিউটার কেন্দ্রের শিক্ষা মনে পড়ে গেছে। টেবিলে বসে কমপিউটারের 'মাউস'টা ধরে সে। সেটাকে পরিচালনা করতে থাকে মনোযোগ দিয়ে।

যেমন করে হোক আটকে রাখতেই হবে দরজা। অজিতের পাশে পিঠ দিয়ে ঠেলে পাল্লা আটকে রাখেন রায়া। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করেন পা দিয়ে রাইফেলটাকে কাছে টেনে নেবার।

মনিটরে একটার পর একটা চিত্র সরে যাচ্ছে। ক্রমশ স্তরের পর স্তর ভেদ করে এগোচ্ছে কমপিউটার দরজা বন্ধ করার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আবার চালু করার দিকে। রিতি তার সমস্ত সত্তা দিয়ে মনোনিবেশ করে আছে কমপিউটার পরিচালনায়।

ধাক্কার পর ধাক্কা আসছে। ক্রমশ সে ধাক্কার জোর বাড়ছে। অথচ অজিত আর রায়া দুর্বল হয়ে পড়ছেন দ্রুত।

কমপিউটার তার এলাকাগুলো পার হচ্ছে একের পর এক। আর একটু বাকি।

আবার দরজা ফাঁক করে হাতটা ঢুকে পড়ে। অজিত আর রায়ার হাত আর কাঁধ টনটন করছে। এই বুঝি হাত ফসকায় তাঁদের।

এসে গেছে, এই এসে গেছে। জায়গাটা এসে গেছে। সঠিক জায়গায় এসে কমপিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয় রিতি। খট করে দরজা বন্ধ হয়ে যায় বৈদ্যুতিন তালায়। মনিটরের পর্দায় লেখা দেখা দেয়—সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

হাততালি দিয়ে ওঠে দীপ। অজিত দরজায় হেলান দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকেন। রায়া ছুটে আসেন পর্দাটার পাশে। একগাল হাসি হেসে অজিতের দিকে তাকায় রিতি। মুখ দেখেই বোঝা যায়, মনে মনে বলছে সে, কেমন কাজটা করলাম বল।

রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে আসেন অজিত। একটা ফোন তুলে নেন। চালু হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ওদিকে ফোন বেজে ওঠে ভবতারণের ঘরে। রাকেশের কপালটা মুছিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। ছুটে এসে ফোনটা ধরেন।

অজিত বলেন, 'মিঃ চক্রবর্তি, ফোন চালু হয়েছে। কনট্রোল রুম থেকে বলছি। দরজা বন্ধ করা গেছে।'

'রিতি আর দীপ?'

'ওরা ঠিকই আছে।'

'অধ্যাপক বোস, এখন একটা বাজে। আধ ঘন্টার মধ্যে হেলিকপটার এসে নামবে হেলিপ্যাডে। আপনারা ভিসিটরস্ সেন্টারের সামনে আসুন। আমি জিপ নিয়ে আসছি। রিতি আর দীপকে বলুন—'

কথাটা শেষ করার আগেই টেলিফোনের মধ্যে ভবতারণ শুনতে

পেলেন কাঁচ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। মুখ শুকিয়ে গেল তাঁর। বলে উঠলেন, 'কী হল, অধ্যাপক বোস, কী হল?'

কোনো উত্তর এল না। উত্তর দেবার মতো অবকাশ নেই। কনট্রোল রুমের একদিকের কাঁচের জানলা ভেঙে ফেলেছে ভেলোসির‍্যাপটর। সেদিকে লক্ষ করে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়লেন অজিত। র‍্যাপটরের যে মুখটা ভাঙা কাঁচের পিছনে দেখা দিয়েছিল, চট করে সরে গেল সেটা।

কোন পথে পালান যাবে এবার? চারদিক তাড়াতাড়ি দেখলেন অজিত। খাবার ঘর এড়িয়ে সোজা হলে গিয়ে নেমে বাইরে যাবার একটাই পথ আছে। নকল ছাদের গ্রীলের উপরের বায়ু চলাচলের পথ দিয়েই একমাত্র যাওয়া যাবে।

ভাগ্য ভালো, একটা অ্যালুমিনিয়ামের মই দাঁড় করানো রয়েছে। সেটা দিয়ে উঠে ছাতে গ্রিলের ভিতরে ঢুকতে হবে। সকলেই মই বেয়ে উঠে গেছে, অজিত সকলের পিছনে, র‍্যাপটর দুটোও ঢুকে পড়ল কনট্রোল রুমে। অজিত সবে গ্রিলের মধ্যে ঢুকে উঠে বসেছেন, পা তুলে নিতে যাচ্ছেন, একটা র‍্যাপটর লাফিয়ে উঠল কমপিউটারের টেবিলে, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কামড়ে ধরার চেষ্টা করল তাঁর পা দুটো। সমস্ত শক্তি একত্র করে জন্তুটার মাথায় লাথি মারলেন অজিত। তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল শয়তান। গ্রিলের ভিতরে ঢুকে সেটা আবার আটকে দিলেন অজিত।

অন্যরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করেছে। প্রথমে রায়া আর দীপ, তারপরে রিতি। পিছনে অজিত। সামনে তাকিয়ে দেখলেন অজিত, দূরে বেরোবার পথ দেখা যাচ্ছে।

নিচে তখন অন্য র‍্যাপটরটা একবার মাটিতে পড়ে থাকা সঙ্গিকে দেখে নিয়ে মুখ তুলে গ্রিলের ভিতর দিয়ে চারজন মানুষের এগিয়ে যাওয়া দেখছে। নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে গজরাতে সেও এগোচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ সোজা উপর দিকে একটা লাফ মারল সে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরল ফ্রেমের কিনারা। তার মাথার ঠেলায় গ্রিলের অংশটা খুলে গেল। সেই অংশের উপরেই ছিল রিতি। মাথার উপরে ছাতের সঙ্গে আটকে গিয়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল

সে। আবার প্রচণ্ড জোরে সেই বিভৎস মাথায় লাথি মারলেন অজিত। পড়ে গেল র‍্যাপটরটা মেঝের উপর। কিন্তু পড়ে গেল রিতিও। পড়তে পড়তে সময় মতো হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ফ্রেম। রিতি ঝুলে আছে। মাটিতে পড়ে গিয়েও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে আবার লাফ দিল র‍্যাপটরটা। তার বিকট হাঁ যখন রিতির পা কামড়ে ধরে ফেলেছে প্রায়, তখন অজিত এক টানে উপরে তুলে নিলেন রিতিকে। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেল মেয়েটা।

খুব তাড়াতাড়ি এগোলেন সকলে আবার। সামনে সরু পথটা দিয়ে বেরিয়ে আরেকটা গ্রিল সরাতেই দেখা গেল তাঁরা এসে পড়েছেন হলঘরের ছাতের কাছে। তাঁদের নিচে লোহার রডের ভারা বাঁধা রয়েছে। তার নিচে রয়েছে ব্র্যাকিওসরাসের কঙ্কাল। এবারে সকলে সেই ভারা বেয়ে নামতে শুরু করলেন। অজিত ধরে ধরে নামাতে লাগলেন বাচ্চাদের।

হঠাৎ উপরের দিকে চোখ গেল রায়ার। মুখ থেকে বেরিয়ে এল চাপা চিৎকার। সকলে উপরে তাকালেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলেন, কে জানে কী উপায়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে একটা র‍্যাপটর।

কিছু করার নেই। সকলে তাড়াতাড়ি কঙ্কালটার উপরে নেমে এলেন। বেয়ে বেয়ে নামতে শুরু করলেন মেঝের দিকে। এইবার র‍্যাপটরটা ঝাঁপ দিল কঙ্কালটার দিকে। লাফিয়ে পড়ে জাপটে ধরল হাড়গুলো।

একদিকে ঝুলে আছে ভেলোসির‍্যাপটর, অন্যদিকে চারজন মানুষ। সেই ভারে কঙ্কালটা দুলতে দুলতে ঘুরতে শুরু করল। অজিত বেশ বুঝলেন, এতটা ভার বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না বহু কোটি বছরের পুরনো হাড়গোড়। কোনো রকমে হাত বাড়িয়ে দীপকে যতটা সম্ভব মেঝের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'লাফিয়ে নামো, দীপ।'

লাফ দিল দীপ। পড়ে গেল মেঝের উপর চিৎ হয়ে। সেখান থেকে বড় বড় চোখে দেখতে লাগল, কঙ্কালের প্রধান ওজনবাহি ছাতে লাগানো আংটা এতটা ভার সইতে না পেরে খুলে আসছে

কংক্রিটের চাঙড়সহ। এক্ষুনি সবশুদ্ধ ভেঙে পড়বে। কিছু বলার আগেই রিতি কঙ্কালটার পাঁজরের একটা অংশ সহ মাটিতে পড়ে গেল। তারপরেই পড়ে গেলেন রায়া। ঠিক তাঁর গায়ের উপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে চলেছে শিরদাঁড়াটা। গায়ে পড়লে সারা শরীর চুরমার হয়ে যাবে। রায়া হাত দিয়ে মাথা ঢেকে প্রস্তুত হলেন প্রচণ্ড আঘাতের জন্য। কিন্তু পাঁজরের হাড়ের নিচে থাকায় তাঁর উপর শিরদাঁড়ার মূল অংশটা পড়ল না। বেঁচে গেলেন রায়া।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেঝে থেকে উঠতে যাবেন, মুখ তুলে রায়া দেখলেন সামনে একটা সাদা পর্দা, তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। দেখতে না দেখতে মাথা দিয়ে পর্দাটা তুলে ধরে মুখ বার করল আর একটা ভেলোসির‍্যাপটর। হতবাক রায়া দেখলেন, ঠিক মুরগির মতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে র‍্যাপটরটা তাঁদের পথ আগলে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়ালেন রায়া। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন রিতি আর দীপকে আগলে ধরে অজিত তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর ঠিক তখনই অন্য র‍্যাপটরটা কঙ্কালের উপর থেকে লাফিয়ে নেমে এগোতে লাগল তাঁদের দিকে আস্তে আস্তে।

দু'দিকে পথ আগলে দুটো ভেলোসির‍্যাপটর। মাঝখানে তাঁরা চারজন। এক্ষুনি ধারালো দাঁত আর নখের আঘাতে সকলের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর বাঁচার পথ নেই। এত কিছুর পরে এভাবে মরতে হবে, অজিতের মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না এই অবধারিত সত্যকে। দুটি বাচ্চাকে শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেন অজিত আর রায়া।

হলের ভিতর দিকে দাঁড়ানো র‍্যাপটরটা মাথা নিচু করে হিস হিস শব্দ করল একবার। তারপর ভয়ঙ্কর হাঁ করে লাফ দিল অজিতকে লক্ষ করে।

কিন্তু লাফটা সম্পূর্ণ করতে পারল না সে। তার আগেই, শরীরটা যখন তার মেঝে থেকে বেশ উপরে, তাকে কামড়ে ধরল অতিকায় দুটি চোয়াল। দুই সারি ছ'ইঞ্চি দীর্ঘ দাঁতের মাঝখানে পড়ে প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেল তার শরীর। দু'বার ঝাঁকুনি দিতেই এলিয়ে পড়ল ভেলোসির‍্যাপটরের দেহ। অজিত আশ্চর্য হয়ে দেখলেন,

মহাকায় টিরানোসরাস র‍্যাপটরের দেহটা মাটিতে আছড়ে ফেলে সেখানেই ছিঁড়ে খেতে লাগল তাকে।

গর্জন করে উঠল অন্য র‍্যাপটরটা। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল টিরানোসরাসের ঘাড়ের উপর। কামড়ে ধরে ঝুলে রইল সেখানে, আর নখ দিয়ে ছিঁড়তে চেষ্টা করতে লাগল টি-রেকসের চামড়া। সেই আক্রমণে ক্ষেপে গেল টি-রেকস্। ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে, মাথা নেড়ে সে ভেলোসির‍্যাপটরের কামড় খুলে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। প্রচণ্ড গর্জনে কানে তালা ধরে যাবার জোগাড়।

এই অদ্ভুত লড়াইএর কী ফল হল তা দেখার জন্য আর অপেক্ষা করলেন না অজিত। ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

দুপুরের সুন্দর রোদ্দুরে ঝলমল করছে দিনটা। বাইরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ভবতারণের জিপ এসে দাঁড়াল তাঁদের সামনে। জিপের পিছনে বসে আছেন রাকেশ। সকলে জিপে উঠে পড়লেন। অজিত বললেন, 'এক মুহূর্তও দাঁড়াবেন না। এক্ষুনি এসে পড়বে টিরানোসরাস।'

দ্রুত গতিতে জিপ ছুটল হেলিপ্যাডের দিকে।

ভিতরে তখন অসম যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। টিরানোসরাসের কাঁধের ঝাঁকুনিতে র‍্যাপটরের কামড় আলগা হয়ে গেল। তার দেহটা এসে পড়ল সেই সাংঘাতিক চোয়ালের আওতায়। হিংস্র আক্রোশে র‍্যাপটরের দেহটাকে কামড়ে ধরে এক ঝটকায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম শ্বাপদ। মৃত্যু হল নৃশংসতম আর সব চাইতে চতুর ডাইনোসরের।

হেলিকপটার অপেক্ষা করছিল। জিপ থেকে নেমে অজিত আর রায়া যত্ন করে রাকেশকে প্রথমে বসালেন ভিতরে। তারপর রায়া উঠলেন রিতি আর দীপকে নিয়ে। অজিত সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, পিছনে আসছেন ভবতারণ, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। পিছনে ঝর্ণা আর জলাশয়। সামনে ডাইনোসর পার্কের অরণ্যানি। চুপ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ভবতারণ চক্রবর্তি। অজিত এসে হাত ধরলেন তাঁর। একজন শিশুর মতোই

অজিতের পিছন পিছন হেলিকপটারে উঠলেন ভবতারণ। তাঁর সব ঔদ্ধত্য আজ নিশ্চিহ্ন।

১মৎকার দিন। নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে কপটার। অজিতের দু'পাশে তাঁর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে রিতি আর দীপ। সেদিকে তাকিয়ে হাসলেন রায়া। কোথায় ক্যামেরার ব্যাগ ফেলে এসেছেন কে জানে। কয়েকটা একসপোজড রোল পকেটে ছিল, সেগুলো বেঁচে গেছে।

ভবতারণের মুখেচোখে এখন বয়সে' ছাপ স্পষ্ট। সব উচ্ছলতা তাঁর চলে গেছে। জানলার আলোর সামনে ছড়িটা ধরে অ্যাম্বারের খণ্ডটা দেখছেন তিনি মাঝে মাঝে।

জানলা দিয়ে অজিত দেখলেন, একটু নিচে উড়ে চলেছে কয়েকটা সামুদ্রিক পাখি। সি গাল আর অ্যালবাট্রস। স্বাভাবিক পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রাণী। জীবন বয়ে চলেছে তার নিজস্ব ছন্দে, প্রকৃতির অকৃপণ ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। প্রয়োজন কী নকল অতীত গড়ে তোলার ? ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে চলাই ভালো, যে ভবিষ্যতের ভাবী স্রষ্টারা এই মুহূর্তে তাঁর দু'পাশে, গভীর ঘুমে মগ্ন।